দুর্গেশের সঙ্গিনী

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২রা আশ্বিন ১৩৩১।

প্রকাশক :—

শ্রীবিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,

বালিয়া দেবীপুর, বর্দ্ধমান।

প্রিণ্টার— শ্রীকালিভূষণ পাল,

মেট্‌কাফ প্রেস,—

১৫নং নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ব. সা. প. পু.
ক্রীত তাং ....

জীবনের দুর্গমপথে

যাহাকে সঙ্গিনী করিয়াছি

তাহাকেই

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

উপন্যাস

নবদ্বীপের বৈষ্ণবী	...	১৲
বঙ্গের গৃহিনী	...	১।০
দেওয়ানা রাণী		১৸০
মুসাফের প্রিয়া	.	১॥
ভিখারিণী শৈল	...	৸০

নাটক

ভীমসিংহ	...	৸০
রতনে রতন	...	।০
স্বরাজগীতাঞ্জলি গান		৵০

উপহার

—:*:—

আমার..

শ্রী .... কে

....

দুর্দিনের সঙ্গিণী

উপহার দিলাম।

স্বাক্ষর...............

তাং.............

দুর্গমের সঙ্গিনী

(১)

এ সংসারে নারীর সব চেয়ে বড় গর্ব্ব বোধ হয়—রূপের গর্ব্ব। শিক্ষাও সভ্যতা তাহাকে যে পরিমাণে উত্তেজিত করে—রূপের গর্ব্ব বোধ করি—তার চেয়ে আরও বেশী করিয়া থাকে—কারণ এই জিনিষটাই তার একান্ত নিজস্ব। রূপের অভাব এই জাতিকে যে পরিমাণে নম্র করিয়া দেয়—রূপ ঠিক সেই পরিমাণেই গর্ব্বিত করে—তা' রূপের অধিকারিণী যতই মার্জ্জিত-রুচি হউন—এসত্য বোধ হয় কোন রমণীই অনুভব করিতে পারেন। নহিলে সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই শক্তি সৌন্দর্য্যের পদানত রহিয়াছে কেন?

শক্তি অবশ্য পদানত থাকিয়াও তাহার অধীনতাকে সচ্ছন্দেই সহ্য করিতে পারে—কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রভুত্বের তীব্র ঝাজ মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার এই সাধের দাসত্বকে একেবারে দুঃসহ করিয়া তোলে। নহিলে বীরেশ্বর রায় বড় লোকের জামাতা হইয়াও পথাশ্রয় করিতে বাধ্য হইবে কেন?

এই বীরেশ্বরের পিতামাতা শৈশবেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন ; আর সে পিতৃব্যের আশ্রয়ে থাকিয়া নিতান্তই পতিতের মত—উদ্যানের মাঝে আগাছার মত আপনিই বাড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহাকে সঞ্জীবিত করিতেও কেহ চেষ্টা করে নাই ; ধ্বংশ করিতেও কেহ লালায়িত হয় নাই। কিন্তু অদৃষ্ট বোধ করি অর্থ দেখিয়াই প্রসন্ন হ'ন না—তাই বীরেশ্বরের ভাগ্যও একদিন জয়গৌরবে সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

সে একবারকার কাল-বৈশাখীর ঝড়ে বিশালকায়া শীতলাক্ষী গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া প্রচণ্ড প্লাবনে বোধ করি তীরভূমিকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল—আর উদ্যত-ফণা মহাভুজঙ্গের মত পশু-পক্ষী যাহাকেই সম্মুখে পাইতেছিল—তাহাকেই নিজের বিরাট বিশাল উদরে টানিয়া আনিয়া নিজের মহামায় মূর্ত্তির কবলস্থ করিয়া দিতেছিল। ঠিক এই সময়েই একখানি নৌকা সেই আবর্ত্তে পড়িয়া ঘূরপাক খাইতে খাইতে স্রোতের মুখে ছুটিতেছিল— মাঝি তাহার আজন্ম সংস্কারের দোহাই দিয়া—সমস্ত শক্তি দিয়া— দেবতার দয়া ভিক্ষা করিয়া কিছুই করিতে পারিতে ছিল না। কারণ দেবতা তখন রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন—তখন সংহার ভিন্ন অন্য বাণী দেবতার মুখেই ছিল না। তখন মানুষের আর্ত্তনাদ জলের আর্ত্তনাদের সঙ্গে মিশিয়া বোধ করি, কোন্ অবাধ অগাধ মৃত্যুর মহাসমুদ্রের দিকে

ছুটিতেছিল, প্রলয়ের ঢেউ চারিদিকে কি মহাপ্রলয়ের সূচনা করিয়াছিল—তাহা চক্ষে না দেখিলে বুঝিবার সামর্থ্য কাহারও নাই—চারিদিকের ধূলিরাশি গগন-গহন-ব্যাপী মূর্ত্তি ধরিয়া বোধ করি সৃষ্টির মাঝেই অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। আর তরঙ্গের সেই তাণ্ডব নর্ত্তন ও বাহিরের ভীষণ দর্শন প্রকৃতি দেখিয়া বেচারী নৌকার আরোহী বোধ হয় ইষ্ট মন্ত্রও ভুলিয়া গিয়াছিলেন—কারণ ঠিক সেই সময়েই একটা প্রকাণ্ড ঝাপ্টা আসিয়া নৌকাখানাকে একেবারে উল্টাইয়া দিল—আর মাঝির আর্ত্তনাদ জলের আর্ত্তনাদে মিশাইয়া গেল। কিন্তু সেই সফেন সলিল রাশির মধ্য হইতে, নিশ্চিত মৃত্যুর অন্ধকার গর্ভ হইতে সহসা যাহার সবল হস্ত বৃদ্ধ আরোহী রমেশবাবুর হাতটা ভীম বলে চাপিয়া ধরিল—তাহাকে যমদূত ভাবিয়াই রমেশ বাবুর লুপ্ত-প্রায় চেতনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

কিন্তু সেই বিলুপ্ত চেতনা যখন পুনরায় চৈতন্য লাভ করিল। আর দেখা গেল যে, যে লোকটা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া ছিল সে যমও নহে, যমদূতও নহে—তাহাদের চেয়েও শক্তিশালা একটা মানুষ মাত্র, কারণ সে তাহার বাহু বলে তাঁহাকে ফিরাইয়া না আনিলে যমদূতের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা তাঁহার কিছু মাত্রই থাকিত না—তখন রমেশবাবু নিরতিশয় আনন্দে তাহাকে আলিঙ্গন

করিলেন। আর এই প্রিয়-দর্শন যুবক নিঃস্ব ও নিঃসহায় জানিয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। শুধু লইয়াই গেলেন না—বীরেশ্বরকে স্ববর জানিয়া নিজের একমাত্র কন্যা সুন্দরী সুষমার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। নিঃস্ব বীরেশ্বর অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইল।

(২)

সুষমা সুন্দরী ছিল বটে, এবং তাহার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল ইহাও সত্য, কিন্তু যে ঐশ্বর্য্য থাকিলে অতি কুৎসিৎ নরনারীও সুন্দর নামে অভিহিত হয়, সুন্দরী সুষমার সেইটাই ছিল না - তাহার হৃদয় ছিল না—আর যাহা ছিল তাহা রূপের গর্ব্বে কি পিতার ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে এতই গর্ব্বিত যে তাহার সঙ্গ বীরেশ্বর কেন—যে কোন পুরুষই বোধ হয় সহ্য করিতে পারিত না। পিতার জীবনদাতা বলিয়া পিতা যে একটা পথের লোককে ধরিয়া আনিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিলেন—ইহা সুষমা পিতার অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার পরিচয় বলিয়া মনে করিল। আর স্বর্গগতা জননীর উদ্দেশ্যে দুই একবিন্দু অশ্রু ফেলিতেও ত্রুটী করিল না।

কিন্তু সুষমাত' বুঝিলনা—যে, প্রৌঢ়ত্বের প্রথম সীমায় পদার্পণ করিয়াই যে দিন তাহার পিতা গৃহিণী স্ত্রীকে হারাইয়া সংসার অন্ধকার দেখিতেছিলেন—সেদিন সুষমা ভিন্ন তাঁহার সান্ত্বনার স্থল ছিল না—সেদিন তিনি এই একটী মাত্র কন্যাকে লইয়াই শোক ও দুঃখকে সহিতে পারিয়াছিলেন। সেত' বুঝিল না যে, আজ এক ধনীর সহিত তাহার বিবাহ দিলে বৃদ্ধ পিতার একমাত্র অবলম্বনের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে হইবে। আর তাহাতে তাঁহার যে দুঃখ হইবে—তাহা কন্যার সহিলেও পিতার সহ্য অত্যন্ত কষ্টকর হইবে। কিন্তু পিতা যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা তিনি করিয়াছেন এবং কন্যা যাহা বুঝিয়াছিল—সে তাহাই করিতে ছিল—কিন্তু মাঝে হইতে বেচারা বীরেশ্বরের দুঃখও অশান্তির অন্ত ছিল না। সে দুঃখীর ছেলে—দুঃখ করিয়া এবং দুঃখের ভাত সুখে খাইয়া তাহার দিনগুলা একরূপ শান্তিতেই কাটিতেছিল। বড় লোকের জামাতা হইয়া এবং ?-রাক্ষে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া এই যে বাহিরের দুঃখের বিনিময়ে সে অন্তরের দুঃখ কিনিয়া বসিল—ইহার প্রচণ্ড শাসনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে কে? সে যে ইহা চায় নাই—চাহিয়া ছিল শুধু বিপন্নের প্রাণ রক্ষা করিতে—আর্ত্তকে উদ্ধার করিতে এবং সেজন্য নিজের প্রাণকে বিপন্ন করিতে ত্রুটী করে নাই, তাহা ত অন্তর্যামীর অবিদিত ছিল না।

কিন্তু অন্তর্যামীর অবিদিত না থাকিলেও দুঃখ তাহাকে পাইতে হইল—এবং বাহিরের প্রাচুর্য্য অন্তরের অতৃপ্তির সজ্ঘাতে নিতাই বিষময় হইয়া উঠিতে লাগিল—আর ঠিক এই সময়েই বীরেশ্বরের শ্বশুর জামাতার হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া চিরনিদ্রিত হইলেন। তিনি বোধ হয় জানিতেও পারিলেন না যে, যাহার হস্তে তিনি কন্যা ও কন্যার সম্পত্তির ভার দিয়া গেলেন—তাহার নিজের জীবনটাই সেদিন দুর্ব্বহভার হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু জীবন তাহার যতই ভার বোধ হউক—আর সে ভার যতই দুঃসহ হইয়া থাকুক—অনন্ত-পথ-যাত্রী শ্বশুর যেদিন তাহার স্কন্ধে নূতন ভার চাপাইলেন—সেদিন তাহার সহনশীল স্কন্ধটাকে পাতিয়া না দিয়া বীরেশ্বর পৌরুষের অবমাননা কিছুতেই করিতে পারিল না—যে স্কন্ধ নিজের ভার বহিতেই শিথিল হইয়া পড়িতেছিল, তাহাতেই আবার নূতন ভার চাপাইয়া লইল এবং শোক ও অশ্রুর বেগ যেদিন পর্য্যন্ত না একেবারে কমিয়া গেল—সেদি[illegible] পর্য্য[illegible] বহন করিতেও হইল। তারপর—যেদিন সংসার আবার নিত্য নিয়মিত পথে চলিতে লাগিল—সেদিন সে সুষমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহাদেরই এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় তিনকড়িকে উহাদের জমীদারীর কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া দিল। সুষমা বুঝিল, দরিদ্রের ছেলে বীরেশ্বর জমীদারীর কার্য্য বুঝিবে না—আর বীরেশ্বর বুঝিল

পরের সম্পত্তি একেবারে নিজের হাতে রাখিয়া নিজেকে ছোট করিব না—যাহা দূরে ছিল—তাহা দূরেই থাকিয়া যাক্।

স্বামী ও স্ত্রী এইরূপে যেদিন বাহির হইতে ক্রমশঃ অন্তরেও পরস্পরের কাছ হইতে দূরে গিয়া পড়িলেন—সেদিন বীরেশ্বরের গৃহবাস অসহ্য হইয়াছে, আর সুষমাও স্বামীসঙ্গ প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়াছে।

(৩)

কিন্তু ইহা অভিমান কি অপমান—বিদ্যুৎ কি বহ্নি স্ফুলিঙ্গ, বজ্র নির্ঘোষ না সত্যকার বজ্র, তাহা বুঝিবার আগে এবং কোনদিন ইহার শুভ পরিণতি হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা তাহা অনুমান করিবার আগেই সেই নব নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ তিনকড়ি যেদিন জমীদারী সংক্রান্ত কি একটা তর্ক লইয়া কতকগুলা খাতা পত্র দিয়া প্রভুকেই প্রহার করিয়া বসিল—সেদিন চিরসংযত বীরেশ্বর রায় এই একবার মাত্র সংযম হারাইয়া দ্বারবান ডাকিয়া তাহাকে উত্তমরূপে প্রহার করাইয়া গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দিল। কিন্তু

পরক্ষণেই গৃহকর্ত্রী জমীদার-তনয়ার মুখবিকৃতি কল্পনা করিয়া নিজের কার্য্যে নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠিল—কারণ এ জমীদারী যে তাহার নয়—এই কথাটাই সুষমার প্রতি আচরণের মধ্য দিয়াই অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিত—আর তাহা বোধ করি বীরেশ্বরের চোখে তত বেশী উজ্জ্বল হইয়া উঠিত না—যদি না সুন্দরী সুষমা নিত্য নূতন প্রসাধনে নিজেকে জমীদার কন্যার সাজে সাজাইয়া তুলিত। যদি না তাহার দেহের উজ্জ্বলবর্ণ হইতে নীল সাড়ীও জ্যাকেটের প্রতি কম্পনটি বলিতে চাহিত—যে সে ধনীর কন্যা—সে শাসনকর্ত্রী তাহার শাসন তোমরা মানিয়া লও।

কিন্তু সে যাহা হউক বীরেশ্বর এই ধৃষ্ট কর্ম্মচারীকে এইরূপ শাসন না করিয়া কি করিতে পারিত। এই কর্ম্মচারী তাহার স্ত্রীর আত্মীয় হইতে পারে এবং সে নিজে দরিদ্রের সন্তান হইতে পারে—কিন্তু সেদিন সে যে স্থানে আসিয়া বসিয়াছিল—সেদিন সেই সমবেত কর্ম্মচারীর মাঝখানে তাহারই অধীনস্থ কর্ম্মচারীর এই বেয়াদবী সে সহ্য করিবে কি করিয়া? বীরেশ্বর জমীদারের পুত্র ছিল না বলিয়াই এই ধৃষ্ট কর্ম্মচারীকে অধিকতর শাস্তি দিতে পারে নাই। কিন্তু যতটুকু শাস্তি সে দিয়াছিল, তাহারই জন্য অন্তঃপুরে যে অনুযোগ উপস্থিত হইবে—তাহাও জানিতে তাহার বাকী ছিল না। কিন্তু সেদিন সত্যকারের শাসন কর্ত্তার তেজ বীরেশ্বরের মধ্যে জাগিয়া

উঠিয়াছিল—তাই যেখানে দুঃখ ও গ্লানি আছে সেস্থান ত্যাগ করিতে তাহার দ্বিধামাত্র ছিল না।

তাই তাহার মত উদার হৃদয় ব্রাহ্মণের মত বিশিষ্ট তেজ লইয়া সেদিন যখন সে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল—তখন সুখ ও দুঃখকে সমানভাবে উপেক্ষা করিবার জন্য হৃদয় তাহার প্রস্তুত হইয়া গেছে। তাই সায়ংসন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া সামান্য কিছু জলযোগ করিবার পরক্ষণেই সুষমার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবও তাহাকে চমকিত করিল না। আর অন্য দিনের মত অনুযোগ মিশ্রিত অভিমানের সুরেই সে স্ত্রীর সহিত আলাপ করিল না করিল হাস্যমুখে—নিবিড় দুঃখকে তরল করিয়া লইবার শক্তিও সুখে—অত্যন্ত সহজ অত্যন্ত সরল স্পষ্ট ও নির্ব্বিকার দুঃখে। সুষমার যদি চক্ষু থাকিত—স্বামীকে বুঝিবার মত প্রেমে প্রাণ পূর্ণ থাকিত—তাহা হইলে এই বেদনায় ভরা, প্রচ্ছন্ন হাস্যে ভরা, গভীর দুঃখকে সহ্য করিবার গরিমায় ভরা মহৎ প্রাণকে সে দেখিতে ভুল করিত না। কিন্তু সুষমা অত্যন্ত সাধারণ রমণী ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না, বেদনার ভাষা তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতেই পারিত না, সে ধনীর কন্যা—সে আদর অভিমান দেখিয়াছে—আদেশ করিতে দেখিয়াছে ও শিখিয়াছে—বড় লোকের স্বাভাবিক অহঙ্কারকেই আয়ত্ব করিয়াছে। মানুষের সত্য পরিচয় কোন্‌খানে—সতীত্বের ও নারীত্বের যথার্থ বিকাশ কোন্‌খানে—

তাহা আঘাত পায় নাই বলিয়াই বোধ হয়—তাহার চোখে পড়ে নাই।

(৪)

তাই বীরেশ্বরের মৃদু হাস্য ও মধুর আলাপ তাহার চক্ষে তিনকড়িকে তাড়াইয়া দিবার অপরাধ ভঞ্জনের মিনতি ও করুণ বিলাপ বলিয়া বোধ হইল। সে পরুষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "তিনকড়িকে তাড়িয়ে দেবার কি প্রয়োজন হ'য়েছিল?"

কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়াই বীরেশ্বর বলিল "সে জমিদারকে অপমান ক'রেছিল।"

"জমিদারকে অপমান করিয়াছিল" বলিয়াই সুষমা মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসিল।

কিন্তু তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বীরেশ্বর বলিল—"জমীদারও তাঁর প্রতিনিধি একই জিনিষ ব'লে জান্‌তাম—আজ থেকে সে ধারণা কি বদলাতে হবে সুষমা?"

"না—কিন্তু কে জমীদারের যোগ্য প্রতিনিধি সে সম্বন্ধে ধারণার একটু পরিবর্ত্তন ক'র্লে ভাল হয়।"

একটা পরিহাস বীরেশ্বরের মুখ পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গেল। এই সমস্ত বিশ্রী আলোচনার পর পরিহাস করিবার আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল "এই সমস্ত আলোচনা কর্ব্বার সত্যিই কি খুব দরকার হ'য়েছে সুষমা?"

"একটু হ'য়েছে এই জন্য যে, আমাদের আত্মীয় যারা, তারা জমীদারীর কাজ ভাল বোঝে তা'দের ওরকম কথায় কথায় তাড়ানো উচিত নয়।"

বীরেশ্বর একবার সুষমার মুখের দিকে চাহিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু চক্ষু দুইটা অর্দ্ধ পথ হইতেই ফিরিয়া আসিল। সে মৃদুহাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি বোধ হয় শুনে থাক্‌বে—যে, সে আমায় মেরেছিল।"

সুষমা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—হাঁ কিন্তু সে তা'র জন্য গুরু শাস্তি পেয়েছে—তা'কে ক্ষমা কর্লেও চল্‌ত।

বীরেশ্বরের একবার ইচ্ছা হইল যে সে জিজ্ঞাসা করিয়া লয় যে, তিনকড়ির অপরাধটা সুষমার বিবেচনায় কতটা লঘু এবং তাহাকে ক্ষমা করিবার জন্য সে এত ওকালতি করিতেছে কেন? কিন্তু এই আলোচনার প্রারম্ভ হইতেই প্রতি পক্ষের উপর তাহার একটা ঘৃণা মিশ্রিত অনুকম্পা জাগিয়া উঠিয়াছিল—তাই সে সম্বন্ধে প্রশ্ন মাত্র না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এখন কি ক'র্ত্তে হবে?"

সুষমা একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল 'কাল তাকে ডেকে পাঠাও।"

"দশ বিশ টাকা মাইনেও বাড়িয়ে দেব কি ?"

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া সুষমা বলিয়া উঠিল—"তুমি কি মনে কর আমি এতক্ষণ তোমার সঙ্গে ঠাট্টা কচ্ছি।"

অত্যন্ত বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া বলিল "আমিও ত' কৈ ঠাট্টা করি নাই।"

সুষমা আর কথা কহিল না ; বোধ হয় কথা কহিতে পারিতেছিল না। সে আরক্ত মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—আর দরজার পাশে গিয়াই কতকটা আদেশের স্বরেই বলিল, কাল তা'কে ডেকে আনতে হবে—তা' ব'লে দিচ্ছি। ঈষৎ হাস্য করিয়া বীরেশ্বর বলিল "তুমিও ত' ডেকে আনতে পার—তা'তে তা'র মানটা অনেক বেশী বাড়বে। তুমি যখন নিজেই জমীদার।"

সুষমা স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ এমনই দৃষ্টিতে চাহিল যে তাহা নিছক ঘৃণা কি অনুকম্পা—কি কোনটাই নয়—কিম্বা উভয়েরই সংমিশ্রণ, তাহা বুঝা গেল না বটে—কিন্তু দৃষ্টি যেন বলিতেছিল—"ইস্—তোমার বড় স্পর্দ্ধা যে—আচ্ছা বলিয়া লও—তোমাকে এর জন্য আর শাস্তি দিব না, আমার যাহা করিবার তাহাই করিবই।" তাহাও বুঝিতে বীরেশ্বরের বাকী রহিল না। কিন্তু সে কোন কথা

বলিবার আগেই সুষমা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল "আমি কি মান বাড়াবার কথাই বল্‌ছি নাকি ?"

সহসা বীরেশ্বরের চক্ষু দুইটা যেন পাংশুবর্ণ ধারণ করিল—সে বাম হস্তে তাহার মাথার চুলগুলা মুঠা করিয়া ধরিয়া একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিল—"না—অপমান কর্ব্বার জন্য"—বলিয়াই সে ঘর হইতে উঠিয়া গেল।

(৩)

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া কিন্তু বীরেশ্বরকে পাওয়া গেল না—আর জমীদারীর কাজকর্ম্ম দেখিবার জন্য তিনকড়িকে আনিতেও বিলম্ব হইল না। বীরেশ্বরের অন্তর্দ্ধান বাটীর সমস্ত লোককেই সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু কেহই স্পষ্ট করিয়া কিছু জানিবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে পারিল না—গৃহকর্ত্রীর সম্মুখে এ সব প্রশ্ন তুলিবার স্পর্দ্ধাও কাহারও ছিল না—সাহসও কেহ করিত না। সুতরাং সে সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চ বাচ্য হইল না—আর বহুদিন অতীত হইবার পূর্ব্বেই যাহা বিশেষরূপেই স্মৃত হইবার প্রয়োজন ছিল—তাহাই বিস্মৃত হইতে লাগিল। সংসার কাহারও

জন্য অপেক্ষা করে না—আর মানুষ সেই সংসারের ছোট ও বড় যন্ত্র ভিন্ন কিছুই নহে—তাহারাও কাহারও জন্য চিরদিন আপশোষ করে না। সংসারে সব চেয়ে কঠিন সত্য স্বার্থ—তাহার পুষ্টি হইলে মানুষ কি স্নেহ ও প্রেমের অভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করে?

কিন্তু মানুষ যাহাই করুক—আর বীরেশ্বরকে অন্য সকলেই বিস্মৃত হইয়া যাক্—বিস্মৃত হইতে পারিল না শুধু সুষমা, আর তিনকড়ি। সুষমা বীরেশ্বরকে ভুলিতে পারিল না—বীরেশ্বর তাহার স্বামী ছিল বলিয়াই হউক, কিম্বা প্রস্থানের পূর্ব্বে বীরেশ্বর একখানি স্মৃতি পত্র রাখিয়া গিয়াছিল তাহার জন্যই হউক। প্রতি প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কোন না কোন আকার লইয়া বীরেশ্বরের স্মৃতি সুষমার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতই—আর তাহার নীরব ভর্ৎসনা শাসন-কর্ত্রী সুষমার চক্ষে সিন্ধু প্রমাণ না হউক বিন্দু প্রমাণ বারি আনিতই—তাহা প্রেমের লাঞ্ছনাই হউক—কি যে উপেক্ষিত, সেই তাহাকেই উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই হউক। হায়রে, মানুষের মন! সে যদি মানুষের আপনই হইত—মানুষ যদি তাহাকে আয়ত্ত করিতেই পারিত—তাহা হইলে পৃথিবী হয়ত' এতদিন মানবের কল্পিত স্বর্গে পরিণত হইত—কিম্বা নরকের অত্যন্ত অন্ধকার কক্ষে রূপান্তারিত হইত। কিন্তু যে বিধাতা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছিল, মনকে বুঝি সে সৃষ্টি করে নাই, তাই মানুষ যখন পাপ করিতে

সে দেখিতেছিল যে, এই বীরেশ্বরের উত্থানে তাহার পতন—আর বীরেশ্বরের পতনে তাহার উত্থান সম্ভব হইয়াছে। বীরেশ্বর তাহাকে অপমান করিয়াছিল বলিয়াই সে গৃহ-বহিষ্কৃত হইয়াছে—আর তাহার স্থানে তিনকড়িকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে—বীরেশ্বর যদি তাহাকে অপমান না করিত—তাহা হইলে তাহার এই ঈপ্সিত সৌভাগ্য লাভ হইত না ভাবিয়াই সে শত্রু হইলেও বীরেশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিল না। আর অন্তরের অত্যন্ত নিভৃত অন্তরে নিজেকে বীরেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিয়া গৌরব বোধ করিতেও দ্বিধা করিল না। কারণ গরীবের ছেলে হইয়াও বীরেশ্বরের অদৃষ্টে যে সুখ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল—তাহা যে একদিন গতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার ললাটেই জয় টীকা অঙ্কিত করিয়া দিতে পারে—সম্ভব না হউক এ কল্পনা করিতেও তাহার কোথাও বাধে নাই। সে চন্দ্রের অদর্শনে চোরের মত লক্ষ্মী লাভ করিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

আর তাই তাহার বিলাস এবং প্রসাধনের মাত্রাটা মাত্রা ছাড়িয়া উঠিতে লাগিল—এবং সামান্য সামান্য কার্য্য লইয়া সে অন্তঃপুরে আসিয়া সুষমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিল; দৃষ্টি কটু হইলেও তাহা লোকের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না এবং তাহার দুই একটা জমীদারের মত স্পর্দ্ধিত আচরণের কথাও যখন সুষমার কানে উঠিল

এবং তাহাতে সে কোন বাধাও দিল না, তখন অন্য লোকের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। আর ইহাদের দুইজনের মধ্যে যে একটা কিছু রফা হইয়া গেছে—অপেক্ষাকৃত দুষ্টলোকে সে কথাটা অপ্রকাশ্যে আলোচনা করিতেও ছাড়িল না।

(৬)

কিন্তু এ সব বাহিরের কথা—ভিতর হইতে সুষমা যে তিনকড়ির পরিবর্ত্তন একেবারেই লক্ষ্য করে নাই—তাহা নহে। কিন্তু এই সব ক্ষুদ্র অভিযোগে দৃষ্টিপাত ও কর্ণপাত করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। সে ইচ্ছা করিয়াই এই সব কোলাহল হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে চাহিত—বুঝিত না, যে তাহার এই অবহেলা ও নিরুৎসাহ আর এক জনের স্পর্দ্ধা ও উৎসাহকে অতি মাত্রায় বাড়াইয়া দিতেছে—আর বাহিরে পদমর্য্যাদায় নিকৃষ্ট হইয়াও প্রকৃষ্ট কর্ম্মচারী যাহারা—তাহারা অত্যাচারে ও অনুশোচনায় অনুক্ষণ বিদগ্ধ হইতেছে। সুষমার সংসারের অন্তরে ও বাহিরে তখন এই দুই বিভিন্ন রকমের অশান্তি আসিয়া ভিতর হইতেই বেশ নাড়া দিতে লাগিল।

কিন্তু সংসার তখন দেখিবে কে? তখন যে সংসারীর মনের

বনে আগুন লাগিয়াছে—তখনও অনুতাপ হয় ত' আসে নাই, কিন্তু বিবেকের পৃষ্ঠে কশাঘাত পড়িয়াছে—আর যাহা হইয়া গেছে, তাহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আকুলতার ও অভাব হয় নাই। স্বামীকে ফিরিয়া পাইবার আর তাহার কাছে নতজানু হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবার মত শক্তি ও প্রবৃত্তি তখনও আসিয়া জুটে নাই বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে যে আচরণগুলা করা গিয়াছে, তাহাদের ফিরিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষার অবধি ছিল না।

তাই একদিক হইতে সুষমার জমিদারীর অংশ বিশেষ স্থানচ্যুত হইতেছে, আর অপর দিক হইতে তিনকড়ির বাড়ী ঘরগুলা নিত্য নিয়ত মাথা তুলিতেছে, তাহা অন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও সুষমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না। আর আকারে ইঙ্গিতে বুঝাইলেও বুঝিল না দেখিয়া, বাহিরের লোক যাহারা তাহাদের মাথা ব্যথা ক্রমশঃ কমিয়া আসিল, আর এই দুই নরনারীর মধ্যে যে একটা স্পষ্ট চুক্তি হইয়া গেছে, তাহাও বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। এমন কি সময়ে অসময়ে তিনকড়িকে জমীদারের ভিতর বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিয়া সাধারণ লোকে যাহা বলিয়া থাকে তাহা বলিতে কেহ ক্রটী করিল না। আর ভিতর হইতে সুষমা শুনিতে না পাইলেও বাহির হইতে তিনকড়ির শুনিতে বাকী রহিল না যে, গ্রামের স্ত্রীলোকেরা সুষমার আচরণে একেবারে বিস্মিত হইয়া গেছে,

এবং এই ছুঁড়ী যে এই উদ্দেশ্যেই স্বামীটাকে বিদায় করিয়াছে—তাহা বুঝিতেও এই ত্রিকালদর্শী রমণী মণ্ডলীর কাহারও বাকী নাই। কারণ তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের কেশগুচ্ছ রৌদ্রতাপেই বোধ হয় পাকিয়া গেছে, তাঁহারা নিজেরা কি করিয়াছেন বলা যায় না—কিন্তু এমন ব্যাপার তাঁহারা অনেক দেখিয়াছেন। আর ইহার ভিতরে যে কি কাণ্ড হইতেছে—তাহা তাঁহারা আঙ্গুল গণিয়াই বলিয়া দিতে পারেন। কিন্তু সুষমা জমীদার কন্যা বলিয়াই হউক কি যে কথাটা তাঁহারা বলিতে পারেন—সে কথাটা কেহ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে নাই বলিয়াই হউক—তাঁহাদের বিদ্যার আর পরীক্ষা হইল না।

কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যার পরীক্ষা হউক আর না হউক, এই সমস্ত কথা হইতে তিনকড়ির অনেক উপকার হইল। কারণ ইহার মধ্যে সত্য যতখানি তাহা তাহার দৃষ্টির বাহিরে থাকিলেও ইহার মধ্যে অসত্য যাহা, তাহাকে সে পুরামাত্রায় উপভোগ করিল—কারণ তাহা আর কিছু না হউক, তিনকড়ির মহা পৌরুষের কথা, এ কথা বুঝিতে তাহার কিছুমাত্র ভুল হইল না। আর সুষমা তখন বাটীর ভিতরে থাকিলেও তাহার মুখ চোখ এ সংবাদে কতখানি আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে তাহা কল্পনা করিয়া তিনকড়ি গর্ব্বানুভব করিতেও ছাড়িল না।

বীরেশ্বর চলিয়া যাইবার পর প্রায় একবৎসর কাটিয়া গেছে।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সুষমার সংসারে সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বটে, কিন্তু' তাহার দেহ ও মনের পরিবর্ত্তন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকিলেও লক্ষ্য করা যাইতে পারিত। আর সবার উপরে জমিদারীর পরিবর্ত্তন ভিতরে ও বাহিরে কাহারও অবিদিত ছিল না। সেদিন তিনকড়ির স্পর্দ্ধা সীমা অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর স্বয়ং জমিদার কন্যার বৈরাগ্য না আসিলেও সংসারের উপর ও সাধের জমিদারীর উপর ভয়ানক বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কারণ নারীকে যাহা সম্ভব সুষমা তাহার চেয়ে অনেক বেশী দূরে উঠিয়া পড়িয়াছিল—তাই এক বৎসর না যাইতেই তাহার উদ্যমের মেরুদণ্ডে বেদনার আভাস পাওয়া গিয়াছে। বীরেশ্বর বর্ত্তমানে যে ভার তাহারই স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল তাহাই তাহার প্রস্থানে সুষমার স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছে। নারী স্বামীকে বিদায় করিতে পারে, অপছন্দ করিতে পারে, পুরুষজাতিকেই ঘৃণা করিতে পারে—কিন্তু পুরুষের মত কর্ম্মশক্তি সে পাইতে পারে না, তা' সে যে কোন দেশের যে কোন জাতির নারীই হউক না। এই সহজ তথ্যটা সুষমা সেদিন বোঝে নাই যেদিন স্বামীর সঙ্গ তাহার অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছিল, যেদিন তিনকড়িকে সম্মানিত করিবার জন্য স্বামীকে অপমান করিতে তাহার অন্তরে বাহিরে কোথাও বাধে নাই।

(৭)

কিন্তু সেদিন যাহা বাধে নাই, আজ তাহা বাধিয়াছে—সেদিন যাহা সুসাধ্য ভাবা গিয়াছিল কালের পেষণে সেইটাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে; আর শান্তি ও তৃপ্তি যেন জন্মের মতই বিদায় লইয়াছে। বীরেশ্বর বর্ত্তমানে সামান্য দাসদাসীদের কলহ এক কথায় মিটিয়া যাইত; একটা ভর্ৎসনায় সকলেই তটস্থ হইয়া উঠিত। আজ কিন্তু তাহাই এক সপ্তাহে মিটে না তা গৃহকর্ত্রী যতই শাস্তি প্রদান করুন। সর্ব্বত্রই অতৃপ্তি, সর্ব্বত্রই অপূর্ণতা সর্ব্বত্রই নারীর শক্তিহীনতার লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সংসারে প্রকাণ্ড অশ্ব আছে, প্রকাণ্ড রথ আছে, কেবল সারথী নাই; আর যে কি নাই তাহা বুঝিবারও সাধ্য কাহারও নাই।

এই অভাব এই অপূর্ণতা শুধু দংশন করিত সুষমাকেই; কারণ মন যতই অস্বীকার করুক, মনের যাহা আত্মা সে যে ভিতর হইতে হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠে, যে, এই অভাবের মূলে তোমার হাত নিশ্চয়ই আছে। আর মন অপরাধীর মত মাথা চুলকাইতে থাকে।

এইরূপেই যখন দিন যাইতেছিল, সেই সময়েই একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনকড়ি কি একটা প্রয়োজনে জমিদার বাড়ীতে

আসিয়াই শুনিল যে, সুষমার অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছে ; সে বৈকাল হইতেই শয্যা ত্যাগ করে নাই। এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই তিনকড়ি একেবারে সুষমার ঘরে আসিয়া সুষমার পায়ে হাত দিয়া ডাকিল "সুষমা"। বাহিরে তখন অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল, ধরিত্রীর কর্ম্ম চাঞ্চল্য ক্রমে শান্তি ও অবসাদের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছিল, বাহিরে বাগানে হেনার ঝাড়ের সুগন্ধ বাতাসের গায়ে ধরিয়া রাখা যাইতেছিল না। আর সুষমার অন্তরে তখন চিন্তারাশিও প্রাবৃটের মেঘের মত ঘনাইয়া আসিয়াছিল তাহাদের ও একুল ওকুল দেখা যাইতেছিল না। ঠিক এই সময়ে কাহার স্পর্শে সুষমা চমকিত হইয়াই উঠিয়া বসিল আর পরক্ষণেই তিনকড়িকে সম্মুখে দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া প্রায় চীৎকার করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "তিনকড়ি যে—এখানে ?"

তিনকড়ি কতকটা থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিল, বড় একটা জরুরি কাজ ছিল, শুনলাম তোমার বড় অসুখ করেছে, তাই দেখতে এলাম—তাহার বলা শেষ না হইতেই সুষমা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল "তাই এখানে আমার ঘরে ? আজ থেকে তোমায় বরখাস্ত করলাম, যাও"। কিন্তু তিনকড়ি প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে আপত্তি করিতে চাহিল, কিন্তু সুষমা চীৎকার করিয়াই তাহাকে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ করিল। আর সেই চীৎকারে সুষমার পরিচারিকা

বসন্ত আসিয়া এই ব্যাপার সম্মুখে দেখিয়া ভিতরে ভিতরে কাঁপিতে লাগিল, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না; অথচ কর্ত্রী যে আজ তাহার রক্ত দর্শন করিবেন না এ বিষয়েও তাহার স্থির বিশ্বাস কিছুমাত্র রহিল না।

কিন্তু তিনকড়ি চলিয়া গেলে সুষমাকে তাহার পশ্চাতেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া উপস্থিত ঝঞ্ঝাটা কাটিল ভাবিয়া সে যখন একটু নিশ্চিন্ত হইবার কল্পনা করিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই সুষমা পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিল "বিবিসাহেব, তোমার এখানে আর পোষাবে না, কাল তোমার জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিয়ে দেশে চলে যাও কিম্বা যেখানে হয় যাও—এ বাটীতে আর চ'লবেনা—বলিয়া বিছানায় গিয়া বসিয়াই আবার বলিয়া উঠিল—"আমার অসুখ হ'য়েছে ব'লে এখানে একটু ব'সতে পার্লে না বুঝি? একেবারে মহলের বাইরে গিয়ে ইয়ারকি দিতে সুরু করেছ? যাও দূর হ'য়ে যাও, দূর হ'য়ে যাও আমার সুমুখ থেকে—বলিয়া যাহাকে দূর করিয়া দিবার জন্য সুষমা স্বহস্তেই দরজা বন্ধ করিতে আসিতেছিল, দেখিল ঠিক সেই হতভাগীই অন্ধকারে সুষমার গৃহতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে—আর ক্রুদ্ধা সুষমা না দেখিয়া ঠিক তাহারই ঘাড়ে পা দিবামাত্রই পা দুটী জড়াইয়া ধরিয়াছে।

(৮)

এই বসন্তকে ঠিক পরিচারিকা বলাও চলিত না—অথচ সখী বলিলেও অত্যুক্তি হইত। কারণ এই দুই সম্বোধনের একটা তাহাকে অপমান করিত, অপরটা তাহাকে অতিমাত্রায় সম্মান দিত। কারণ বসন্ত সুষমার পরিচারিকার মত থাকিলেও তাহার মত দরদী পরিচারিকা প্রায় দেখা যাইত না বলিয়াই সুষমা কখনও তাহাকে হীন কাজ করিতেও দিত না। কিন্তু শাসনটা চলিত সব চেয়ে বেশী এই বেচারী বসন্তর উপরেই; কারণ সদাসর্ব্বদা সম্মুখে থাকিত সেই, সুতরাং গৃহিণীর প্রসাদ হইতে পদাঘাত প্রথম প্রাপ্য হইত তাহারই। তবু এই দুই প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে এমনই একটা সহজ সম্বন্ধ আপনিই জন্মিয়াছিল—যাহা অন্যের সহিত হওয়াও সম্ভব ছিল না—আর হইলেও বিপরীত ফল ফলিত নিশ্চয়ই। এই সুষমার ভিতরে বাদসাহজাদীর মত তেজ ছিল—যাহা বসন্ত ছাড়া সহিতে কেহই পারিত না। কারণ এই বাদশাহজাদীর অন্তরের কোন্ নিভৃত গুহায় অশ্রু সঞ্চিত আছে—তাহা এই বসন্ত ছাড়া আর কেহই জানিত না।

এই বসন্ত ভদ্র গৃহস্থেরই মেয়ে—সে সুশিক্ষিতা না হইলেও অশিক্ষিতা ছিলনা—আর নারীর যে গুণ থাকিলে তাহাকে পূজা

না করিয়া থাকা যায় না, সেই গুণ তাহার ভিতরে এতই বেশী ছিল যে সুষমার মত নারীও তাহার গুণমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে নাই। প্রভু তাহাকে পদাঘাত করিলে বসন্তর সহিষ্ণুতা বিচলিত হইত না—কারণ সে জানিত যে, প্রভুকে এই পদাঘাতের জন্য পরিতাপ করিতে হইবেই—আর সেইটাই হইবে তাহার পুরস্কার। শক্তিমান শক্তি-হীনের অঙ্গে প্রহার করিয়া শক্তির অপব্যবহার বোধ হয় মাঝে মাঝে করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে অনুতাপ করিতে হয়—সুষমার আচরণে এ সত্যের বারংবার পরীক্ষা হইয়া গেছে।

তাই আজ তাহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া বসন্ত সুষমার পা জড়াইয়া ধরিতে দ্বিধা করে নাই—কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ব্যাপারটা যাহাই হইয়া থাকুক দোষটা সুষমার নিজেরই—নহিলে সে কখনও এতখানি রাগিয়া আগুন হইত না। পরের দোষে যখন সুষমা রাগ করে—তখন সে এতটা লম্ফঝম্ফ করে না, বরং কতকটা নীরবেই শাস্তি কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু নিজের অপরাধে যদি কখনও রাগ হইত—তাহা হইলে তাহার ক্রোধ অগ্নি কাহাকে ভস্ম করিবে তাহা খুঁজিয়াই পাইত না, তাই লম্ফঝম্পের ও অবধি থাকিত না। এই শিক্ষা আর কাহারও না হউক—বসন্তর হইয়াছিল। আর সেদিন বসন্তর নিজেরও দোষ ছিল—সে গৃহে সন্ধ্যার প্রদীপ পর্যান্ত দেয় নাই এবং অসুস্থ সুষমার কাছেও বসে নাই।

কিন্তু তাহার অপরাধ ভঞ্জন সে যখন পা ধরিয়া করিল—আর সুষমারও তাহাতে কিছুমাত্র বলিবার শক্তি রহিল না—তখন সে অগত্যা শয্যাতেই ফিরিয়া গেল—আর নিজের ক্রোধের আগুনে নিজেই গর্জ্জিতে লাগিল।

কারণ আজই সর্ব্বপ্রথম সুষমা বুঝিতে পারিল যে, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। নারীর শ্রেষ্ঠগুরু বলিয়া যাহাকে চিরদিন লোকে সম্মান দিয়া আসিয়াছে—দরিদ্র বলিয়া অত্যন্ত উপেক্ষা করিয়া তাহাকেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা যতই শক্তিমতী এবং যতই ধনীর কন্যা হউক—সুষমার যে অতিরিক্ত স্পর্দ্ধার প্রকাশ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে তাহার বেশী দিন বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু সেই স্পর্দ্ধার শাস্তি যে আসিতে পারে—তাহা শাস্তি না আসা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে নাই বলিয়া এতদিন অনুশোচনার পূর্ণ পরিণতি হয় নাই। কিন্তু সেই অনাগত শাস্তি যেদিন আসিল—আসিল তিনকড়ির হাত হইতেই অপমান রূপে, তখনই অশ্রু আসিল—ক্রোধ আসিল—অনুশোচনা আসিল—আর মন চীৎকার করিয়া কাতরস্বরে ডাকিতে লাগিল "কোথায় আজ তুমি দেবতা এস' ফিরিয়া এস—তোমার ঘর যে কিছুতেই পূর্ণ করা যায় না—তোমার অভাব যে কিছু দিয়াই ভুলিয়া থাকা যায় না—নারীর অপরাধের জন্য নারীর ইষ্ট দেবতা তুমি রুষ্ট হইও না।"

(৯)

কিন্তু হায় রে, ইষ্ট দেবতা যে তখন ইষ্টসিদ্ধি করিবার পথ হইতে বহুদূরে সরিয়া গেছে—তখন যে নারীর কণ্ঠ তাহার পাদমূলে পৌঁছিবার পথ হইতে অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে।

তাই নারীর ক্রন্দন ক্রন্দনেই শেষ হইল—অভীষ্ট ফল মিলিল না। অনুশোচনা নিত্য দগ্ধ করিতেই লাগিল—তাপের শান্তি হইল না—আর বৎসরের পর বৎসর সুষমার মানস-গৃহে মলিন বেশে আসিয়া প্রভাত হইতে লাগিল—আর তাহার সঙ্গে রূপের গর্ব্ব ক্ষমতার মত্ততা শোকের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। কারণ তাহারই গৃহে গৃহদেবতা গোবিন্দের মন্দির প্রাঙ্গণে যখন বসন্তোৎসবের বাদ্যধ্বনি ও কল্লোলিত উল্লাস সমস্ত গ্রামের পুরনারীবৃন্দকেই ফাগের বর্ণে রক্তবর্ণ করিয়া তুলিত—তখন সুষমাই শুধু রিক্তের মত পতিতের মত নির্জ্জনে তাহার স্বামীর গৃহাভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া তাহার অজানা পথের পথিক স্বামীর পরিত্যক্ত বসন-ভূষণগুলার পানে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া থাকিত।

বাহিরে তখন আনন্দ কোলাহলে গৃহ-প্রাঙ্গন ভরিয়া গেছে—আর ভিতরে শুধু উষ্ণ অশ্রুজল নীরব, নীরব একেবারে সুখৈশ্বর্য্য-

স্পর্শ-বিরহিত হইয়া সেই গৃহের গৃহিনীকেই অশ্রুজলে আকুল করিয়াছে। তখন বাহিরে বাদ্যধ্বনি পলকে পুলকে শিহরণ জাগাইয়া দিত, আর ভিতরে সারি সারি বারিবিন্দু কতনা পুলকময় স্মৃতিকে প্রতি পলকে অভিষিক্ত করিয়া দিত। আর ধরণীতে বসন্ত ও উপরে অনন্ত যিনি, তিনি ভিন্ন গৃহে যার আনন্দ উৎসব সে গৃহের গৃহিনীর এই মনোবেদনার কথা—এই নিভৃতে অশ্রু বর্ষণের কথা কেহই জানিত না। কারণ বসন্তোৎসবে অন্য সমস্ত পরিচারিকারা উৎসব করিতে চলিয়া গেলেও যাইত না কেবল বসন্ত এবং সেই শুধু অন্তরালে দাঁড়াইয়া সুষমার ভাবান্তর লক্ষ্য করিত; অথচ সম্মুখে আসিয়া কোন উপায়ে তাহাতে বাধা দিবার সুযোগ করিতে পারিতনা—কারণ যতবড় দরদীই সে হউক আর সুষমা তাহাকে যতখানি যত্নই করুক—এত বড় স্পর্দ্ধা সে কখনই সহ্য করিবে না। কিন্তু পরিচারিকা হইলেও বসন্তর অন্তরে এমন একটা সমবেদনার ভাব জাগ্রত ছিল, যে এই প্রায়-সমবয়সী নারীর দুঃখে তাহার অন্তর অত্যন্ত ব্যথিত হইত—তাই বসন্তোৎসব হইয়া গেলে একদিন সে সুষমার কাছে আসিয়া বলিল "রাণীমা, আমি একবারে তীর্থ যাত্রা ক'র্ব্ব—আমাকে ছুটী দেবার হুকুম হোক।"

কথাটা শুনিয়াই সুষমার অধরে মৃদুহাস্য জাগিয়া উঠিয়াছিল—হাসিতে হাসিতেই সে বলিল—"তীর্থযাত্রা—" বলিয়াই কিন্তু পরক্ষণে

সে অত্যন্ত অন্তমনস্ক হইয়া গেল। যেন তাহার মন ঠিক এই সংসার, এই বাটী গৃহ উদ্যান ছাড়িয়া সত্যই এক অজানিত তীর্থে চলিয়া গেছে। যেন ঠিক এই জিনিষটাই সে এতদিন অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছে, অথচ কোথাও পায় নাই—যেন এক অপূর্ব্ব কস্তুরীর প্রচ্ছন্ন মদির-গন্ধে সে এতকাল শুধু আকুল হইয়াই উঠিয়াছে—কোথাও সেই দুর্ল্লভ বস্তুর সন্ধান পায় নাই—যেন দেব-মন্দিরে সন্ধ্যারতির সমস্ত অঙ্গই সুসম্পন্ন হইয়াছে—শুধু দুন্দুভিধ্বনি হয় নাই—তাই দেবতাও শয্যাগ্রহণ করেন নাই। আর আজ এতদিন পরে তাহার অনুসন্ধিৎসু হৃদয় বুঝি ঠিক সেই বস্তুর সন্ধান পাইয়াছে—বুঝি নন্দনকাননের জীবিত স্বর্ণমৃগের সুগন্ধ নাভি আজ তাহার করায়ত্ত হইয়াছে—বুঝি দেবমন্দিরে বহু আকাঙ্ক্ষিত দুন্দুভি-ধ্বনি আজ ধরাপৃষ্ঠেই শোনা গিয়াছে—তাই দেবতার মুখে হাস্য ও আনন্দের অবধি নাই।

তবু সুষমা নিজের মনে আজ যে বস্তুর সন্ধান পাইল—তাহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াই কপট গাম্ভীর্য্যে উত্তর দিল "এই বয়সেই তীর্থযাত্রা—কিন্তু দু'দিন ভেবে উত্তর দেব বসন্ত, আজ এ কথা থাক্!"

সুষমার মনে যে ছোপ লাগিয়াছে তাহা বুঝিয়াছিল বলিয়াই বসন্ত জেদ করিয়া বলিল "আমার ছুটী চাই রাণীমা, ভেবে চিন্তে 'না' বল্‌লে চ'ল্‌বে না। আমাকে দয়া কর্ত্তে হবে।"

"কেন বল্ দেখি—দয়াটা আমার কাছে বড় সস্তা হ'য়ে উঠেছে নাকি ?"

বসন্ত হাত দু'টা জোর করিয়া বলিল "কার কাছে তবে এ দয়া চাইব রাণীমা—আমরা ত তোমারই"—বলিয়া সে বোধ করি আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু সুষমা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "বসি, তুই যে আজ কাল খুব খোসামোদ কচ্ছিস—কোথায় যাবি বলত ? আর কোথাও চাকরী পেয়েছিস নাকি ?"

"চাকরীর জন্য ত' আমার ঘুম হ'চ্ছেনা—তোমরা গরীব লোক পেলে দুটো কথা শুনিয়া দিতে ত' ছাড়না। তোমরা বড় লোক কোথাও ত' যেতে চাবেনা—বলিয়া বসন্ত বোধ হয় অন্যত্র যাইবার জন্য উঠিতেছিল—কিন্তু সুষমা সহসা তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া বলিল "তোর যে বড় স্পর্দ্ধা হ'য়েছে বসি—কি ব'লবি খুঁজে পাচ্ছিস্ না বুঝি ?"

বসন্ত গলাটা একটু নামাইয়া বলিল "সত্যি মা, চলনা—তোমাকে নিয়ে দিনকতক ঘুরে আসি—আমরা গরীব লোক পয়সা খরচ ক'রে আর কত জায়গায় যাব ?"

সুষমা এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে বেদনা বোধ করিয়াই মুখখানাকে একটু গম্ভীর করিয়া বলিল—সত্যি, আমারও একবার বেড়াতে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে, দেখি—বলিয়া আরও অন্যমনস্ক হইয়া গেল।

বসন্ত তবু বলিতে ছাড়িল না যে, তাহাকে সঙ্গে লইলে সে কৃতার্থ হইয়া যাইবে—কিন্তু সুষমা সে কথার আর কোন উত্তরই দিলনা।

সুষমা সেদিন কোন উত্তর দিল না বটে; কিন্তু তাহারই সপ্তাহ পরে সে স্বয়ং বসন্তকে লইয়া তীর্থ যাত্রার উদ্দ্যেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। কারণ গৃহ সেদিন আর গৃহ ছিল না অরণ্য হইয়াছিল, আর অন্তরে সেদিন সেই ডাক আসিয়া পৌছিয়াছিল যাহাকে উপেক্ষা করিবার মত শক্তি নারীর দেহ লইয়া সুষমা কেন কোন রমণীরই ছিল না।

(১০)

এইরূপেই এই দুই প্রভু ও ভৃত্য যেদিন পরস্পরের অন্তর অন্তরেই বুঝিয়া লইয়া পথে বাহির হইল, সেদিন তাহাদের মধ্যে বোধ করি সম্বন্ধেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কারণ সুষমার সঙ্গে যে একজন মাত্র ভৃত্য গিয়াছিল তাহাকে ছাড়িয়া দিলে আশাও নৈরাশ্যে আনন্দ ও অবসাদে সুষমাকে উৎফুল্ল রাখিতে ও বিপদে অশ্রু মিশাইতে বসন্ত ভিন্ন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না।

কিন্তু বসন্ত যাহা মনে করিয়া পথে বাহির হইয়াছিল, অনেক দিন এবং অনেক দূর ভ্রমণ করিয়াও যখন তাহা সিদ্ধ হইল না তখন

সে শুদ্ধ অতিমাত্র দুঃখিতই হইল না; অত্যন্ত লজ্জিত হইল, এই ভাবিয়া যে সুষমা এতদিন গৃহ কোণে বসিয়া থাকিয়া হয়ত একরূপ ভালই ছিল; আজ তাহার পলায়িত স্বামীর সন্ধানে তাহাকে পথে বাহির করিয়া এই বিরহিনী নারীকে বসন্ত বিরহের যে সত্যমূর্ত্তি দেখাইয়া দিল, নৈরাশ্য-পীড়িত হৃদয় লইয়া সে যখন গৃহপথে ফিরিবে, তখনকার ক্ষোভ ও লজ্জার হাত হইতে তাহার প্রভুপত্নীকে সে রক্ষা করিবে কি দিয়া? আর এতদিন যাহার জীবন ও মৃত্যু সন্দেহের বিষয় ছিল, আজ অনুসন্ধানেও তাহাকে যখন পাওয়া গেল না, তখন যে তাহার মৃত্যু সম্ভাবনাই অধিক, এ চিন্তা ত কিছুতেই রোধ করা যাইবে না এই দুঃখই বা সুষমাকে সে কেন দিল?

অথচ ইহা যে ভালই হইয়াছে, স্পর্দ্ধিতা নারীর কুকার্য্যের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, ইহা ভাবিতেও তাহার মন সঙ্কোচ বোধ করে নাই; স্বামীকে অপমান করিবার প্রতিফল যে কতকটা পাইতেই হইবে যে নারী স্বামীকে একবার ভাল বাসিয়াছে সেত' তাহা বুঝিবেই। তাই ভৃত্য হইয়াও বসন্ত একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল আর মনে মনে বলিতে ছিল, হে ভগবান যাহা হইয়াছে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও সুষমা অনেক করিয়াছে। এতদিন স্বামী থাকিতেও স্বামীহীনা হইয়া থাকা, ভৃত্যের হস্তে অপমানিত হওয়া, আর

সংসারে একান্ত একাকী থাকা, নারী হইয়া পুত্রে বঞ্চিত থাকা নারীর যতগুলা দুরদৃষ্ট তাহা সে ভোগ করিয়াছে, তাহাকে এইবার দয়া কর, তাহার স্বামীর সন্ধান দিয়া দাও, আমি স্বামীহীনা বলিয়াই এই নারীকে দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হয়।

আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াই সুষমা মানুষ চিনিতে শিখিয়াছিল তাই বসন্ত যে তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসে—পরস্পরের মধ্যে প্রভুভৃত্যের দূর সম্বন্ধ থাকিলেও এ সত্যটা আবিষ্কার করিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। তাই অত্যন্ত অবসাদের সময় সে মাঝে মাঝে বসন্তকে কাছে ডাকিয়া বলিত "বসন্ত তোর এত মাথা ব্যথা কেন ব'লতে পারিস্, আমিত' বেশ ছিলাম বাপু।"

সুষমা ও বসন্তর মন যেদিন এই নৈরাশ্যপীড়িত আশার মাঝে দোল খাইতেছিল সেদিন তাহারা প্রয়াগের মুনিজন-সেবিত তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আর স্নানে ও দানে পূজা ও অর্চ্চনায় নিত্যনিয়ত প্রাণের বেদনা প্রাণের প্রভুর পদে অঞ্জলি দিতেছে। পথে সন্ন্যাসী দেখিলে সুষমার কথা যাহাই হউক, বসন্ত তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ না করিয়া ছাড়িত না; আর তাহারই অনুরোধে কয়েক দিন সন্ন্যাসী ভোজনও তাহাদের বাটীতে হইয়া গেছে; দক্ষিণাদানেরও ক্রটী হয় নাই। কিন্তু প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্তির কোন আশা তখনও দেখা যায় নাই, তাই অন্বেষণের শান্তিও হয় নাই আর অন্বেষণ করিবার যত্ন

ও চেষ্টায় শ্রান্তিও আসে নাই। কিন্তু নৈরাশ্য তাহার অধিকার বৃদ্ধি দিন দিন করিতেছিল বলিয়াই তাহারা গৃহে ফিরিবার জন্য প্রায় প্রস্তুত হইতেছিল, আর যতদিন না শ্রান্তি আসে ততদিন থাকিয়া যাইবার কল্পনাও করিতেছিল। কিন্তু যাওয়া বা থাকা কোনটাই ভাল লাগিতেছিল না। চিত্ত শুধু চীৎকারে কাঁদিয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু পরিশেষে নারীর অন্বেষণ চেষ্টার সম্পূর্ণ অবশেষে, অশ্রুজলের ভিতর দিয়া যেদিন যাওয়াই স্থির হইল, আর জিনিষপত্র বাঁধাবাঁধির কোন কার্য্যই বাকী রহিল না, সেদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সুষমা বোধ করি তাহার পীড়িত চিত্তকে প্রভাত সমীরে একটু স্নিগ্ধ করিয়া লইবার জন্যই জানালা খুলিয়া দিতেই দেখিল, নিশার অবসান হইয়াছে। প্রতীচির কারাগৃহ ভেদ করিয়া প্রাচীর আকাশের নীল বক্ষে রক্ত সূর্য্যের প্রথম অভ্যুদয় হইয়াছে; আর তাহার জবাকুসুম-সঙ্কাশ বিকাশে ধরিত্রীর বৃক্ষলতা নদী ও দূর পর্ব্বত শ্রেণী স্বর্ণালোকে ভাসিয়া গেছে। যেন জীবনের কোথাও অন্ধকার নাই কোন বেদনা হাহাকার পীড়িতের আর্ত্তনাদ ও প্রবলের অত্যাচার নাই, যেন পৃথিবীতে কোথাও মরুভূমি নাই; এখানে যাহা আছে তাহার সবই সুন্দর। অসুন্দর যাহা ছিল, তাহার নিঃশেষে অবসান হইয়াছে।

কিন্তু এই সময় বহির্দ্বারে কাহার করতাড়না শুনিতে পাইয়াই সুষমা নিজেই নীচে আসিয়া দেখিল যে, যে কুলি রমণীটা নিত্য

আসিয়া তাহার অসুস্থ স্বামীর সেবার জন্য অর্থ ভিক্ষা করিয়া লইয়া যাইত, সে আসিয়া একেবারে কান্নাকাটি লাগাইয়াছে। তাহাকে চুপ করিতে বলিয়া তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই সে বলিল যে তাহার স্বামীর অসুখ অত্যন্ত বাড়িয়াছে এবং সুষমাকে দয়া করিয়া একবার তাহাকে দেখিতে যাইতেই হইবে। কারণ তাহার স্বামী মরিয়া গেলে সে আর কিছুতেই প্রাণ রাখিবে না, দরিয়াতে ঝাঁপ দিয়া নিশ্চয় পাপপ্রাণ বিসর্জ্জন দিবে।

রমণী তাহার পাপপ্রাণ বিসর্জ্জন দিবে কি না সে বিষয়ে বিচার করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না বটে, কিন্তু এই নীচজাতিয়া নারীর অপূর্ব্ব স্বামী ভক্তি দেখিয়া ভক্তি ও বিস্ময়ে সুষমা একবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার বাহিরের দেহের ভদ্র আবরণ সঙ্কুচিত হইতে চাহিল না বটে, কিন্তু মন এই অনার্য্য নারীর পদতলে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল আর ক্রন্দনেরসুরে বলিতে লাগিল "ওগো সতী, আরও কিছু-দিন আগে আমার কাছে আস' নাই কেন? তোমার কাছে আমার যে অনেক শিখিবার ছিল। আজ—আজ রিক্তহস্তে গৃহ ফিরিতেছি। তোমার দেওয়া এই মহৎ শিক্ষা এ জনমে আর কাজে লাগিল না। যদি সংস্কার ধ্বংশ না হয় তাহা হইলে পর জন্মে আমি তোমার মত কুলি হইব,—তোমার মত সতী হইব।" কিন্তু চক্ষু যে এই অবসরে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল তাহা যখন ধারাস্পর্শে সে বুঝিতে পারিল তখন

কতকটা অপ্রতিভ হইয়াই সে উপরে চলিয়া গেল ; আর একখানা শাল কাঁধে করিয়া একেবারে দরোজায় আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কি মনে হইতেই সে একবার বসন্তকে ডাক দিতেই দেখিল যে বসন্ত তাহার ডাক দিবার পূর্ব্বেই একখানা চাদর টানিয়া লইয়া তাহার পশ্চাতে আসিবার জন্য দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে। সে আসিলে সুষমা আর কিছুমাত্র না বলিয়াই নিঃশব্দে পথে বাহির হইল। বসন্তও নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল। কিন্তু কুলিরমণীটা ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিতে লাগিল যে একদিন কাঠ ভাঙ্গিতে গিয়া তাহার স্বামী কিরূপে বুকে আঘাত পায় আর তাহা হইতেই ক্রমে জ্বর হইয়া সে এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে বোধ হয় তাহাকে আর বাঁচান যাইবে না। ডাক্তার দেখাইবার সামর্থ্যও তাহার নাই আর থাকিলেও ডাক্তার কি বলে, তাহার বুঝিবার সামর্থ্যও তাহার নাই, হায় গো তাহার কি হইবে, তোমরা দয়া করিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইয়া দাও।

কিন্তু তাহার প্রাণ বাঁচাইবার আগে তাহার স্বামীর প্রাণ বাঁচান যে বেশী দরকার তাহাই বলিয়া দ্রুতপদে সুষমা কুটীর দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াই দেখে যে, কুটীরাভ্যন্তরে যে লোকটি সত্যই অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় পড়িয়া আছে সে আর কেহই নহে, তাহারই বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বামী বীরেশ্বর রায়।

(১১)

নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে সহসা বজ্রপতন হইলে মানুষ যতটা স্তম্ভিত হয়, সুষমা বোধ করি তা'র চেয়ে কম বিস্মিত হয় নাই, তাই যে স্নেহ ও অনুকম্পা লইয়া সে ভিখারিণীর কুটীর দ্বার পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছিল—তাহাই সহসা বজ্রে পরিণত হইল—সে কুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়াই রমণীকে প্রশ্ন করিল "এ তোমার স্বামী ?"

অত্যন্ত সরল ভাবেই রমণী উত্তর দিল "হাঁমা, এ আমার জানের জান—আমার এই স্বামী।

সুষমার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতে চাহিল—হা ভগবান্ আর কত বড় শাস্তি আমাকে দিবে—তাহার মত রাজরাণীর স্বামীকে একটা সামান্য কুলী রমণী তাহার মুখের উপর দাঁড়াইয়া বলে যে "এ আমার স্বামী।"

কিন্তু তাহারত' কোন উপায় ছিল না। সেখানে দাঁড়াইয়া আত্ম-পরিচয় দিতেও তাহার মাথা কাটা যাইতেছিল, অথচ এই রমণীর অসহনীয় স্পর্দ্ধাও অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমাদের বিয়ে হ'য়েছিল ?"

"না না বিয়ে হবে কেন ?" বলিয়া কুলী রমণীটা মেঘের মাঝে

বিজলীর ছটার মত একবার হাসিয়া উঠিয়া বলিল যে, ওর বৌ ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল—পথে বেরিয়ে—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল—রমণী গর্ব্বভরে বলিয়া উঠিল "আমি ওকে পথ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি মা, ওকে বাঁচিয়ে দাও।"

হায় রে, এই কুলী রমণী যদি জানিত যে, কাহাকে বাঁচাইয়া দিবার কথা সে সুষমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছে—কিন্তু সে কথা সে জানুক আর নাই জানুক সুষমার যে বলিবার কিছুই ছিল না তাহা যে শুধু অন্তর্যামীই জানিতেছিলেন। তাই সে মনে মনে বলিতেছিল যে হে ভগবান্ এ আজ কি করিলে দয়াময়! যাহাকে খুঁজিবার জন্য সহস্র সন্ন্যাসী ভোজন করাইয়াছি, সন্ন্যাসীর গৃহে গৃহে সন্ধান করিয়াছি—আজ তাহাকে কি মূর্ত্তিতে ফিরাইয়া দিলে প্রভু? আজ কি তবে এই কুলী রমণীর সঙ্গে স্বামী লইয়া বিবাদ করিতে হইবে না কি? আমার অপরাধের শাস্তি কি আর কোন রকমেই একটু লঘু করা যাইতে পারিত না দয়াময়?

কিন্তু দয়াময় তাঁহার কার্য্য করিয়াছেন—তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ ত' সুষমা করিতেই পারে না। কারণ সে যাহাকে উপেক্ষা করিয়া ত্যাগ করিয়াছিল, আর একজন তাহাকে আদর করিয়া তুলিয়া লইয়াছে—ইহাতে বিধাতার অবিচারই বা হইয়াছে কোন খানে? আর সুষমাই বা নালিশ করিবে কি স্পর্দ্ধায়?

কিন্তু আজ এতদিন পরে তাহার স্বামীর উপর সুষমার আবার অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিয়া গেল। এই আমার স্বামী—যাহার অদর্শনে আমি কত না অশ্রু বর্ষণ করিয়াছি? এই কি সেই নারীর দেবতা? যাহার জন্য আমি সত্যকারের দেবতার দিকেও ফিরিয়া চাই নাই? এই কি সেই দেবতা—যে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ভাবিয়া আমি শয়নে ভোজনে তৃপ্তি পাই নাই? হা ভগবান্ সত্য ও কল্পনা প্রায়ই সমান হয় না বটে, কিন্তু পরস্পর এত বিরোধী হয় এত' কখনও দেখি নাই?

সুষমার চক্ষে জল আসিয়াছিল কি না বলা যায় না—সে কুটীর দ্বার হইতে ফিরিয়া পথে বাহির হইয়া ডাকিল "আয় বসন্ত!"

বসন্ত এতক্ষণ একেবারে প্রভুর পদতলে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রভু তখন নিদ্রার ঘোরে কি রোগের ঘোরে আচ্ছন্ন ছিলেন তাহা বুঝা গেল না, সুতরাং কি করিবে তাহাও বুঝিতে পারিতেছিল না। এমন সময় প্রভুপত্নীর ডাক শুনিয়া সে অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আর প্রভুপত্নীকে গমনোন্মুখ দেখিয়া স্থির সংযত স্বরে হাসি ও অশ্রু মিশান স্বরে রঙ্গ ও ব্যঙ্গ মাখান সুরে জিজ্ঞাসা করিল "দেবতার গায়ে মাটী লাগলে বুঝি পূজা কর্ত্তে নেই মা?"

সুষমা পা বাড়াইয়াছিল, সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইল। স্বামীকে এই অবস্থায় দেখিয়া তাহার স্বভাবজাত প্রচণ্ড অভিমানে যে ঘা

পড়িয়াছিল, তাহারই পৃষ্ঠদেশে আর একটা ঘা পড়িল। ফিরিয়া গিয়া সে স্বামীর শয্যার পাশে বসিল আর বসন্ত এই সুযোগে সেই কুলী রমণীকে দিয়া একটা ডাক্তার ডাকাইতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে আসিয়া দূরে বসিল।

(১২)

গৃহকে যেদিন গ্রহ ভাবিয়া বীরেশ্বর পথে বাহির হইয়াছিল, সেদিন পথের দুঃখ ও বেদনার কথা তাহার মনেই উঠে নাই। পথ যে কুসুমাস্তৃত নয় কণ্টকাকীর্ণ, এ সত্য বোধ হয় মানুষের কাছে অপরিচিত নহে। কিন্তু সে কণ্টক যে চরণেই মাত্র বিদ্ধ হয় অন্তরকে শতক্ষত করে না তাহাও সেদিন তাহার ভাবিবার যথেষ্ট কারণ জন্মিয়াছিল। তাই দুঃখকে সে দুঃখ বলিয়া কল্পনা করে নাই। কারণ তাহার প্রকৃত:রূপ না দেখিলে শুধু কল্পনায় তাহাকে ধরিবার সাধ্য কাহারও নাই। তাই বীরেশ্বর পথে বাহির হইয়াছিল পথকেই শুধু অবলম্বন করিতে, আত্মীয় স্বজনের গৃহদ্বারে গিয়া আশ্রয় লইতে নয়।

কিন্তু পথে বাহির হইয়া আসিয়া প্রথম উত্তেজনায় যতদূর যাওয়া যায় তাহা যাওয়া হইয়া গেলে, যখন ভাবিবার সময় আসিল যে, জীবনে সে কোন্ পথ গ্রহণ করিবে তাহার একটা শীঘ্র মীমাংসা

হওয়া প্রয়োজন, তখনই সমস্যা জটিল হইয়া আসিল। জীবনে তাহার বৈরাগ্য হয়ত' আসিয়াছিল, কিন্তু বৈরাগ্যের বহির্ব্বাস পরিয়া সাধু সাজিতে তাহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি হইল না, আর গ্রাম ছাড়িয়া বনে গিয়া ঈশ্বরের দেওয়া বনফলে উদরপূর্ত্তি করিবার শুভাকাঙ্ক্ষা ও তাহার কিছুমাত্র জাগিল না। সে সংসারের মানুষের মতই বেড়াইয়া ফিরিতে লাগিল। শুধু লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্য বিহীন প্রতাড়িত পথিকের মত।

এমনই সময়ে একদিন একটা প্রকাণ্ড প্রান্তর পার হইয়া প্রান্তর প্রান্তে গ্রামে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্যে যাইতে যাইতে সহসা অত্যন্ত বৃষ্টিতে ভিজিয়া বীরেশ্বরের জ্বর হইল; আর যে গৃহস্থের গৃহদ্বারে গিয়া সে আশ্রয় ভিক্ষা করিল তিনি বীরেশ্বরকে আশ্রয় দিতে ত্রুটী করিলেন না বটে, কিন্তু এই অজানিত অতিথিকে তিনি কি চক্ষে দেখিলেন তাহা বীরেশ্বর বুঝিতে পারিল না। কিন্তু সে সম্মানের ভিখারী হইয়া যায় নাই, গিয়াছিল নিতান্ত আশ্রয় ভিখারী হইয়া; কারণ সম্মান তখন তাহার প্রয়োজন ছিলনা—আশ্রয়েরই প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু গৃহকর্ত্তা তাহাকে কোন্‌টা দিলেন তাহাও বুঝিবার মত অবস্থা তখন তাহার ছিল না। তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ই তখন আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল এবং আশ্রয় পাইবার পরক্ষণেই তাহার চেতনা একেবারে বিলুপ্ত হইল।

তারপর সেই দিনই রাত্রি শেষে বীরেশ্বর এমনই প্রলাপ বকিতে লাগিল যে, সেখানে তাহার কেহ আত্মীয় থাকিলে হয়ত' কাঁদিয়াই সারা হইত। কিন্তু সে যাহা হউক বীরেশ্বরের সেই উদ্দাম প্রলাপ দুই দিন পরে যখন একেবারে অবসান হইল এবং রোগীর দেহে জীবনের লক্ষণ থাকিলেও চেতনার লক্ষণ পাওয়া গেল না—তখন সেই বাটীর এক প্রভুভক্ত ভৃত্য বোধ করি প্রভুকে অকল্যাণের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্যই—বীরেশ্বরকে এক নদীতীরে ফেলিয়া রাখিয়া গেল।

কিন্তু ভৃত্য তাহার প্রভুকে অকল্যাণ হইতে রক্ষা করিলেও বীরেশ্বর এই অকল্যাণময় পৃথিবী হইতে রক্ষা পাইল না—সে শ্মশানে গিয়াও জীবন লাভ করিল। আর তাহার চেতনা বিহীন দেহে যখন চৈতন্যের সঞ্চার হইল, তখন বীরেশ্বরের অত্যন্ত কাঁপুনী আরম্ভ হইয়াছে। সম্মুখে সন্ধ্যা বোধ করি তাহার জীবন সন্ধ্যারই সূচনা করিতেছিল, নদীতীরের ঠাণ্ডা বাতাস অন্তরের অন্তরাত্মাকে কাঁপাইয়া দিতেছিল, আর তাহারই মাঝখানে বীরেশ্বর পড়িয়াছিল, অনাবৃত ধরণীর বুকে, অনাবৃত আকাশের নীচে—নিঃস্ব অসহায় বীরেশ্বর, সংসারের সকল স্নেহে বঞ্চিত সর্ব্বদিক হইতে বিতাড়িত। তখন প্রবল জ্বরে তাহার আপাদ মস্তক কাঁপিতেছিল, তথাপি একবার মাথা তুলিয়া বনান্তরালে কোন বৃক্ষতলে আশ্রয় লইবার জন্য সে

উঠিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পা ও মাথার কোনটাকেই ঠিক রাখিতে না পারিয়া তিন তিনবার ধরাশায়ী হইল। তার পর অশ্রুপূর্ণ চক্ষে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল "ভগবান্ এইখানেই আমার স্থান নির্দ্দেশ ক'র্লে প্রভু?" এবং পরক্ষণেই পুনরায় মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আর রাত্রি তাহার চারিদিকে গভীর কালোমূর্ত্তি লইয়া ঘিরিয়া ধরিল, নদীতীর নিবিড় আঁধারে আচ্ছন্ন হইল।

বীরেশ্বর ভগবানকে ডাকিয়া চুপ করিল বটে, কিন্তু সেই জনমাত্র-পরিত্যক্ত শ্মশানে, সেই গভীর বনরাজি-বিরাজিত প্রান্তরের মাঝখানে মানুষই থাকিতে পারে না, তা ভগবান থাকিবেন কি করিয়া? ভগবান ছিলেন না বটে, কিন্তু এই বিশ্ব সংসারটা পৃথিবীর যাবতীয় নরনারী ও পশুপক্ষী লইয়া নাকি তাঁহারই নিজের রচনা, তাই স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলেও দৃষ্টিটা তাঁহার নির্জ্জন নদীতীরেও নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, আর মরণোন্মুখ বীরেশ্বরের শেষ করুণ আর্ত্তনাদ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই, ভগবানের কর্ণে গিয়া পৌছিয়াছিল। তাই বীরেশ্বর প্রভুকে ডাকিয়া যখন প্রভুর পদতলে পৌছিবার জন্যই যাত্রা করিল—ঠিক তখনই সেই বিজন বন হইতে এক বিজনবালা আসিয়া তাহার শিয়রে বসিল। বোধ করি সে বন পথ দিয়া কোথাও যাইতেছিল আর মন তাহার হয়ত' অত্যন্ত বিষাদে ও বেদনায় পৃথিবীও পার্থিব

জীবনের উপর নির্ম্মম হইয়া উঠিয়াছিল—তাই এই নির্জ্জন নদীতীরে শ্মশানের মাঝখানে সন্ধ্যার অন্ধকারে মৃতপ্রায় বীরেশ্বরকে জীবিত ভাবিতে ও জীবনের উপকূলে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে একাকিনী রমণীর কোথাও বাধিল না। সে বীরেশ্বরের অবস্থা একবার মাত্র দেখিয়াই দূরে পল্লীবালকেরা যেখানে আগুণ জ্বালাইয়া খেলা করিতে-ছিল, সেখানে ছুটিয়া গিয়া তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু সহসা এক রমণীকে অন্ধকার হইতে আলোকে আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাহাকে প্রেতিনী ভাবিয়া সকলেই যখন পলায়ন করিল, তখন অগত্যা সে খানিকটা অগ্নি লইয়া আসিয়া বীরেশ্বরের হাতে ও পায়ে অগ্নির উত্তাপ দিতে লাগিল।

প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া অগ্নির উত্তাপ দিয়া যখন রোগীর চেতনা ফিরিয়া আসিল তখন সে মাত্র একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল, কিন্তু পরক্ষণেই পদতলে অগ্নির উত্তাপ অনুভব করিয়াই সে উঠিয়া বসিল এবং সেই ঘন অন্ধকারে মাঠের মধ্যে পড়িয়া আছে বুঝিতে পারিয়াই বোধ হয় শ্রান্তিতেই চক্ষু বুজিতে ছিল কিন্তু এই সময় তাহার শুশ্রূষাকারিণী জিজ্ঞাসা করিল বাবু উঠ্‌তে পার্ব্বেন ?

বাবু যেন কতকটা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে ?"

রমণী একটু হাসিয়াই উত্তর করিল "আমিই ত তোমাকে

বাঁচিয়েছি, ওঠ, আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতেই বীরেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিল না, রমণীর কাঁধের উপর তাহার মাথাটা লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু সে শক্তিমতী তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া বলিল "ভয় নাই বাবু পায়ে হেঁটে চল, কাছেই একটা ভাঙ্গা কুঁড়ে আছে সেইখানেই আজ রাত্রি কাটাব চল।

বীরেশ্বর নারীর স্নেহ ও প্রেম মাখান মুখের দিকে একবার চাহিল; চাহিয়াই সোজা হইয়া দাঁড়াইল আর অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল "চল' বলিয়া ধীরপদে সেই মৃত্যুর উপকূল ত্যাগ করিয়া গেল; ধনীর উপেক্ষিত রত্ন কাঙ্গালিনী কুড়াইয়া লইয়া গেল।

(১৩)

তারপর বীরেশ্বর যে দিন সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল সে দিন তাহার জীবনের এক নূতন শিক্ষা হইয়া গেছে। জীবনের এক মসীলিপ্ত অধ্যায় শেষ করিয়া আসিয়া সে আর এক নূতন অধ্যায়ে পদার্পণ করিয়াছে। সে দিন তাহার চোখে পৃথিবীতে তাহার কোন আত্মীয় নাই—পৃথিবীতে তাহার কোন কর্ত্তব্য নাই—তখন তাহার জাবন বেদনাহীন স্বচ্ছন্দ ও শান্তিময় হইয়াছে। তখন সে ইচ্ছা

করিলে হয়ত' দেবার্চ্চনাও করিতে পারে কিম্বা পশু শীকার করিয়াও জীবন কাটাইয়া দিতে পারে। কারণ সে ভাবিয়া দেখিল যে জীবনে তাহার উৎসব কখনও আরম্ভ হয় নাই—সুতরাং ছন্দোহারা হইবার ও ভয় নাই। পথেই তাহার জীবন কাটিয়াছে, হয়ত' পথেই কাটিবে। এই পথ হইতেই তাহাকে একজন কুড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল, গিয়া দু'দিন আদরও করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সখ মিটিয়াছে, সে দূর করিয়া দিয়াছে—আজ আবার একজন তাহাকে পথ হইতে—মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে, আর যতদিন না তাহার সখ মিটে, ততদিন সে নিশ্চয়ই তাড়াইয়া দিবেনা। আর যদি বীরেশ্বরের জীবনের সাধ ও সখের শেষ হইয়া থাকে—তাহা হইলে হয়ত' সে আগেই চলিয়া যাইতে পারিবে। তবে আর তাহার দুঃখ করিবার কি আছে? সে একদিন ধনী না হইয়াও ধনীর বিলাসে কাটাইয়া আসিয়াছে, আজ সে তাহার সত্যকার অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়া দুঃখ করিবে কিসের জন্য? শক্তিমান পরমেশ্বরের জয় হউক, সে এই খানেই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবে। আর যত দিন না মৃত্যু আসিয়া তাহার জড়দেহকে স্থানান্তরিত করিতে চায় ততদিন আর এস্থান হইতে নড়িবে না।

কিন্তু পরিবর্ত্তন যে মানুষের স্বভাব-জাত-সংস্কার; নিজের আলস্য ও নিশ্চেষ্টতা তাহাকে যতই আবদ্ধ করিয়া রাখুক, প্রাণে যে পরিবর্ত্তনের

অভাব প্রাণকে আকুল করিয়া তুলে, তাহার শাসন ত' মানুষের দেহ মন লইয়া অমান্য করা চলে না। তাই বীরেশ্বরও কিছুদিন একস্থানে অবস্থান করার পরে যেদিন স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, সেদিন বীরেশ্বরের পত্নী সুষমা স্বামীর সন্ধানে পথে বাহির হইয়াছে। কিন্তু এই দুই একই সূত্রে গ্রথিত নরনারীর মধ্যে সেদিন এমনই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে, একজন যখন চলিত অশ্বে, যানে, নিজের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়া, ইতরদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়া, আর একজন তখন চলিত পদব্রজে, ক্লিষ্ট দেহে, ইতর ও ইতর জাতীয়দের সঙ্গে, ভদ্রদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিছিন্ন থাকিয়া। একজন যখন থাকিত প্রাসাদে—অট্টালিকায়, ভদ্রপল্লীতে, অপরজন তখন থাকিত কুটীরে, পথপ্রান্তে, ইতর পল্লীর অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে। আর হয়ত' এই দুই পরম আত্মীয়ের চরমকালেও দেখা হইত না—যদি বীরেশ্বর প্রয়াগের পথে আসিয়া পীড়িত হইয়া না পড়িত, আর বিপন্না কুলী রমণী অনন্যোপায় হইয়া ঠিক সুষমার গৃহদ্বারেই হাত পাতিয়া না দাঁড়াইত।

কিন্তু সে যেরূপেই হউক এই অসম্ভাবিত মিলন এক দিন হইল, কিন্তু সেদিন সুষমা ও বীরেশ্বরের মধ্যে প্রকাণ্ড যে বাধা আসিয়া পড়িয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিবার সাহস ও স্পর্দ্ধা কোন পক্ষেরই ছিল না—কারণ সুষমা যাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল তাহাকে আর

এক জনের আলিঙ্গন হইতে কাড়িয়া লওয়ার স্পর্দ্ধা তাহার থাকিতেই পারে না ; আর পথে যে পরম স্নেহে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল তাহাকে ত্যাগ করিয়া বীরেশ্বর পুরুষত্ব ও মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিবে—সুষমার সঙ্গে বন্ধনটা ধর্ম্মের বন্ধন হইলেও ততটা শক্তি সেদিন আর তাহার ছিল না।

তাই কয়েকদিন সেবা শুশ্রূষার পর বীরেশ্বর রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়াই সুষমা ও বসন্তকে দেখিয়াই যখন অতিমাত্র বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা যে ?" তখন সুষমা শুদ্ধ মাত্র একটু কাঁদিয়াছিল—আর কোন উত্তরই দিতে পারে নাই। কিন্তু বসন্ত সমস্ত কথা প্রভুর পদে নিবেদন করিয়া যখন প্রভুর ইচ্ছা জানিতে চাহিল—তখন প্রভু শুধু একটু হাসিলেন মাত্র। তারপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন "আমি এত নীচে প'ড়ে গেছি বসন্ত, যে তোমাদের বাড়ীর উঠানে পা দিতে আমার আর সাহস নেই—আমাকেই খোঁজবার জন্য যদি এসে থাক ত' ফিরে যাও।"

বসন্ত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বারংবার শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিল তা হ'তেই পারে না—আমরা এত কষ্টে যখন আপনাকে খুঁজে পেয়েছি, তখন আর ছেড়ে যেতে পারব না।"

মৃদু হাসিয়া বীরেশ্বর তাহার নূতন সঙ্গিনীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, আমি ত একে ছেড়ে যেতে পার্ব্ব না।

"তা ওকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন।"

গম্ভীর হইয়া বীরেশ্বর বলিল তা' হয় না বসন্ত—পেছনে যে জীবন আমি ত্যাগ করে এসেছি সেখানে আমি মৃত। আমাকে মৃতজ্ঞানে তোমরা তোমাদের পথ প্রস্তুত ক'রে নাও। ও আমায় যে ভাবে বাঁচিয়েছে—সে যে কি করে সম্ভব হ'য়েছিল তা' জানিনা—আর বোধ হয় ওর মত করে ভাল বাস্‌তে না পালে' সে কাজ সম্ভব হয় না। আমি আজ আর পাপপুণ্য মানি না বটে—কিন্তু ওকে ত্যাগ করায় যে কত বড় পাপ হবে—তা' আমি কল্পনাও কর্ত্তে পারি না।

কুলী রমণীটা এতক্ষণ দূরে বসিয়াছিল—এই সময় সে কাছে আসিয়া বলিল "বাবু তোমার বাড়ী যাও, আমি আবার কয়লার খনিতে কাজ কর্ত্তে যাব' বলিয়া ঘন ঘন চক্ষু মুছিতে লাগিল।

কিন্তু বাবু তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল "নারে 'মুনিয়া, আমার কি আর যাবার জো আছে? আমি যে এখন কুলী হ'য়ে গেছি—আমায় ওরা জাতে নেবে কেন? তুই যা' তোর কাজ ক'রগে। আমি কোথাও যাব না।"

মুনিয়ার এই সব দৃশ্যগুলা মোটেই ভাল লাগিতেছিল না, কিন্তু পাছে বাবু চলিয়া যায় সেই ভয়ে স্থানত্যাগও করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু বাবু যে কুলী হইয়া গিয়াছে আর তাহাকে তাহার

আত্মায়েরা জাতে লইবে না ; শুনিয়া সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াই সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

সে উঠিয়া গেলে সুষমা আসিয়া স্বামীর পদতলে প্রণাম করিয়া বলিল, তোমাকে আমি অপমান ক'রেছিলাম বটে, কিন্তু তার জন্ত আমিও অল্প দুঃখ পাই নাই। তুমি যার কাছে—যেখানে থাকলে সুখে থাকবে সেখানেই থাকো ; আমি শুধু মাঝে মাঝে এসে এই তীর্থে তোমায় দেখে যাব' এই অধিকার থেকে আমায় বঞ্চিত ক'র না—বলিতে বলিতে তাহার স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল। বসন্ত দূরে বসিয়া কাঁদিতেছিল, বীরেশ্বর তাহাদের ক্রন্দন দেখিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "আচ্ছা এসো অধিকার আমি তোমায় কোন দিনই দিই নাই, কোন দিন বঞ্চিতও কর্ব্ব না।"

বসন্ত কাঁদিয়া কাটিয়া চক্ষু লাল করিয়া শেষে বলিল "আমরা শীঘ্রই ফিরে আসব বাবা, তুমি যেন এখান থেকে আর পালিও না।"

অত্যন্ত ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বীরেশ্বর বলিল, "না বসন্ত, আমি যে ক'টা দিন বেঁচে থাক্‌ব' বোধ হয় আমায় এইখানেই থাক্‌তে হবে।"

(১৩)

সুষমা ও বসন্ত চলিয়া গেল। প্রাণকে পশ্চাতে ফেলিয়া দেহ যে ভাবে চলিয়া যায়, সেই ভাবেই এই দুই নারী চলিয়া গেল—আর হতভাগিনী সুষমা বারংবার অশ্রুপূর্ণ নেত্রে স্বামীর কুটীরের দিকে চাহিতে লাগিল—বুঝি তাহার মনে হইতেছিল যে, তাহার সেই দয়াময় স্বামী বোধ হয় এত নিষ্ঠুর হইবেন না—বোধ হয় তাহার পশ্চাতে তিনিও আসিতেছেন। কিন্তু যতবারই তাহার দৃষ্টি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল—ততবারই অশ্রু দ্বিগুণ হইয়া সম্মুখের পথ অদৃশ্য করিয়া দিতেছিল—আর মনে হইতেছিল যে, ওরে হতভাগিনী, তোর যে সম্মুখে পথ নাই—পথ যাহা তাহাত' তোর পশ্চাতেই রহিয়া গেল।

কিন্তু তাহার এই অবস্থা দেখিয়াই বোধ হয়, বসন্ত আসিয়া তাহার হাত ধরিল, আর প্রায় জোর করিয়াই তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। কিন্তু যে মুহূর্তে কুটীরখানি তাহাদের দৃষ্টির বাহিরে বনান্তরালে আছন্ন হইল, সেই মুহূর্তেই তাহারা পথের উপর বসিয়াই আকুল ক্রন্দনে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল।

আর বীরেশ্বর তাহার ধর্ম্মপত্নীকে বিদায় করিয়া দিয়া যে বেদনা শুদ্ধ পৌরুষের জোরেই বাহিরে প্রকাশ হইতে দেয় নাই—সুষমাও

বসন্ত'র পদরেখা দূর পথপ্রান্তে বিলীন হইতেই তাহারই ভারে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল; আর চক্ষের জলবিন্দুগুলাকে পুনঃপুনঃ মুছিতে মুছিতে বলিতে লাগিল "ওগো প্রিয়া, আজ তোমার নারীত্বের যে অপমান করিলাম, তাহা শুধু আর এক নারীর মান রাখিবার জন্য, তাহা যেন ভুলিও না—ভুলিয়া আমাকে কাপুরুষ মনে করিও না—তুমি অনেক অপমান করিয়াছিলে বটে—কিন্তু তোমার আহ্বানে আজ আর নীরব থাকিতাম না; কিন্তু তাহা হইলে ভালবাসার মর্য্যাদাও রাখা হইত না, তুমি আমায় মার্জ্জনা করিও।"

কিন্তু সুষমা তাহাকে মার্জ্জনা করুক আর নাই করুক, যেহেতু এই বিদায় দেওয়া ও নেওয়ার কার্য্য শেষ হইয়া গেছে, আর সুষমা দূরে থাকিয়া তাহাকে মার্জ্জনা করুক কি না করুক, তাহা বীরেশ্বরকে স্পর্শই করিতে পারিবে না তাহাও সত্য, তবু আজ এই বিদায় দেওয়াকে উপলক্ষ্য করিয়া অতীত ও বর্ত্তমানের জমাট বাঁধা দুঃখগুলার মাঝখানে যে একটা মস্তবড় ব্যবধানের সৃষ্টি হইল, তাহার অবশ্যম্ভাবী দুঃখ-কল্পনাকে শুধু চোখের জল দিয়া রোধ করা যাইতেছিল না। তাই বীরেশ্বর ভাবিতেছিল যে এ যদি মিথ্যা হইত, জীবনের এই যে এতদিনকার দুঃখ কষ্ট গ্লানি ও মান অভিমানের সমস্ত ব্যাপারটাই স্বপ্ন হইত—তাহা হইলে এই বিদায়টা সত্যিকারের অশ্রুজলের ভিতর দিয়া জন্মের মত বিদায় না হইয়া, আনন্দাশ্রুর ভিতর দিয়া

একটা নিবিড় আলিঙ্গন হইত—আর বক্ষে বক্ষ স্পর্শের আনন্দ স্বপ্নের সমস্ত নিরানন্দেরই একসঙ্গে অবসান করিয়া দিত। আর—আর কিছু না হউক সুষমাকে সজল চক্ষে ফিরিয়া যাইতে হইত না—অপরাধিনী হইলেও সে যে তাহার স্ত্রী তাহার আশ্রয় ভিখারিণী—ধর্ম্মপত্নী—

কিন্তু ঠিক এই সময়েই দূর হইতে মুনিয়াকে আসিতে দেখিয়া সে মনে মনে হাসিয়া উঠিল, আর মনেই বলিতে লাগিল কে কার স্ত্রী আমি কুলী, দীন দরিদ্র কুলী—ভগবান্ আর সন্দেহে ফেলিও না প্রভু! অতীতকে তোমার পদপ্রান্তে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছি—আর যে পথে যাইতেছি সে পথ যেমনই হউক, আর তাহার শেষে স্বর্গই থাকুক কি নরকই থাকুক, সেখানে গিয়া যেন একটা অক্ষুন্ন দীর্ঘ নিদ্রার অবসর পাই, যেন অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ডুবাইয়া দিয়া প্রকাণ্ড এক মহাসুপ্তির মাঝে ডুবিয়া যাই।

(১৩)

শুধু সজল চোখে নয়, সারাপথ কাঁদিতে কাঁদিতেই সুষমা শূন্য গৃহে ফিরিল। শূন্যগৃহ, একেবারে উৎসবগীতি-শূন্য—প্রাণও জাগরণের চিহ্ন-পরিশূন্য। এই আশাশূন্য কারাগৃহে অধিকতর শূন্য মন লইয়া ঘর করা যে কতবড় শাস্তি তা অবস্থায় না পড়িলে কি পুরুষ কি নারী কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। শুধু তাই নয়, এই অন্তঃসার-শূন্য জীবন লইয়া জমীদারের যে আবরণ তাহাকে আজও রক্ষা করিতে হইতেছে, তাহাই তাহাকে অন্তরে অন্তরে পীড়িত করিতেছিল। এই যে আজও এই গৃহের চারিপার্শ্বে কদম্বের শ্রী ও বকুলের সুরভি নিত্য এই গৃহের অধিবাসী সমস্ত নরনারীর ইন্দ্রিয়কেই সচেতন করিয়া দিয়া যায়, ইহা যে তাহারই স্বহস্তে রোপিত—যাহাকে এই গৃহ ও গৃহশ্রী হইতে জোর করিয়া বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাহা যতই মনে হয়, মন যেন ততই অপ্রসন্ন হইয়া উঠে—আর এই নিত্যদৃষ্ট বস্তুগুলার সঙ্গে তার সম্পর্ক কিছুতেই ভুলিয়া থাকা যায় না বলিয়া আকুল ক্রন্দনে অভিষিক্ত হইয়া উঠে।

কিন্তু এই দুঃখ এই বেদনা এই ক্রন্দন ও অনুশোচনার অন্ত কোথায়? সম্মুখে সুষমার যে দীর্ঘ জীবন পড়িয়া আছে, সে জীবনের

সারাপথটা যদি এই অশ্রুরাশির ভিতর দিয়াই অতিক্রম করিতে হয়, তাহা হইলেই বা এই বেদনার পরিসমাপ্তি হইবে কোথায়? এই মর-জীবনের বেদনারাশি দিবসের অন্তে জীবনের পথপ্রান্তে যেখানে সন্ধ্যা আসিয়া দেখা দিবে, যেখান হইতে পা বাড়াইলে আর আলোকের মুখ দেখা যাইবে না—যেখানকার জীবনকে জীবন বলিলেও নরলোকের মর-জীবন বলা আর চলিবে না, সেখানে সারা জীবনের এই দুঃখ বেদনা ভাবনার জমাট বাঁধা গুরুভারকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া যাওয়া চলিবেত? না কি এই বেদনার ছালা পৃষ্ঠে বহিয়া জীবনের পরপারে দাঁড়াইয়া বেদনার বেসাতী করিতে হইবে? তাহাই ভাবিতে ভাবিতে সহসা একদিন অন্তরের অভ্যন্তরে প্রশ্ন উঠিল যে, তাহার এই ব্যথা ও বেদনার শেষ যেখানেই হউক মূল কোথায়? অন্য সব নারীর মতই সুষমা কেন শান্তিতে জীবন কাটাইতে পারিলনা, কেন স্বামীকে অপমান করিয়া এভাবে নিজেকেও সংসারকে রিক্ত করিয়া দিল? সংসারে তাহার পরম স্নেহময় পিতা ছিল, পরম প্রেমময় স্বামী ছিল, তাহার বিরাট বিশাল সংসারে দাস দাসী আত্মীয় স্বজনে গৃহ পূর্ণ হইয়া আছে। একদিন ত ছিল এই গৃহের আনন্দ ও হাস্য কোলাহলকে গৃহের পরিমিত স্থানে আবদ্ধ রাখা যাইত না। পুরাঙ্গনাদের হাস্যলহরী বাহিরের পথ ঘাট ও উদ্যানকেও পরিপূর্ণ করিয়া দিত। তাহার এই পরিপূর্ণ সুখের মাঝে এই যে অপূর্ণতা শুদ্ধ

তাহাকেই বঞ্চিত করিয়া রাখিল, ইহার প্রকৃত কারণ কোন্‌খানে? হে ভগবান্‌ এর জন্য অপরাধী কে?

সুষমার চিন্তা যখন খুব নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল—সেই সময়েই সম্মুখের বৃহৎ আয়না খানায় তাহার প্রতিচ্ছবি দেখিয়াই সুষমা সহসা চমকিয়া উঠিল। যেন তাহার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর একবারে মূর্ত্তি ধরিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল—দর্পণে যে সুন্দরীর প্রতিচ্ছবি শুধু দর্পণকেই নয় সমস্ত গৃহকেই আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল, এ সেই সুন্দরী, যে তাহার স্বামীকে অপমান করিয়াছে ও তাহার গৃহে অশান্তি ডাকিয়া আনিয়াছে। সুষমার ভিতরের এই রূপের গর্ব্ব এবং তাহার পশ্চাতে তাহার পিতার অগাধ সম্পত্তি তাহার গর্ব্বিত হৃদয়কে অধিকতর গর্ব্বিত করিয়াছে, তাহা বুঝিতে সুষমার বাকী রহিল না। সুষমা সেদিন মনে করিতেও লজ্জিত হইতেছিল যে যৌবনের রূপরাশি যেদিন তাহার ললিত অঙ্গে পল্লবিত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, সেদিন সত্য বটে সে এই দর্পন সম্মুখে দাঁড়াইয়াই তাহার অনাবৃত বক্ষের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া কুন্দদন্তে অধর দংশন করিয়া কল্পনা করিয়াছিল যে, নিশ্চয়ই কোন রাজা আসিয়া তাহাকে রাণী করিয়া লইয়া যাইবে। শুধু কল্পনাই নহে, ইহা যে সত্য হইবে, এই রূপসী যে রাজার ছেলের হাত ছাড়া হইবে না—শৈশব হইতেই আত্মীয় ও অনাত্মীয়গণে বহুবার তাহাকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

আর কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনের সজ্জিত তরণীর উপর পদার্পণ করিতে যাইবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যখন নর ও নারীমাত্রেরই সুখ কল্পনা অত্যন্ত নিবিড় অত্যন্ত রঙ্গিন হইয়া উঠে, তখন সুষমা সেই সব আশ্বাস বাণী অত্যন্ত আশার সহিত আলিঙ্গন করিয়াছিল।

কিন্তু সেই অনাগত রাজপুত্রের পরিবর্ত্তে যেদিন দীন দরিদ্র বীরেশ্বর আসিল, সেদিন একপক্ষের যেমন ভয় ও সঙ্কোচের অবধি ছিল না। অপর পক্ষের তেমনই ঘৃণা ও বিদ্বেষের অন্ত ছিল না। তাই বীরেশ্বরই যখন কল্পিত অনাগত রাজপুত্রের স্থান অধিকার করিল, তখন ক্রোধে ও ঘৃণায় সুষমার সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু সেদিন জ্বলিয়া ছিল বলিয়া সে যে স্বামীকে বরাবরই অশ্রদ্ধা করিতে লাগিল এবং পরিশেষে এক ভৃত্যের চেয়েও হীন ভাবিয়া তাহাকে অপমান করিল, সে এই রূপ আর তাহার এই রূপরাশির পাশে তাহার পিতার রূপার রাশি ; তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র রহিল না। তাই আজ এতদিন পরে প্রায় সর্ব্ব সুখ হইতেও সর্ব্ব স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া দেহ ও মনে যখন বেদনা ধরিয়া রাখা যাইতেছিল না, তখনই সর্ব্বাগ্রে তাহাদের সংহার করিবার কথা মনে জাগিয়া উঠিল ; আর হয়ত এই নব কল্পনার কিয়দংশ কার্য্যে পরিণত করিতেও সে ত্রুটী করিত না, কিন্তু ঠিক এই সময়ে বসন্ত সেখানে আসিয়া তাহার নির্জ্জন

কল্পনাতে বাধা দিল এবং কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই বলিল—মা, আমাকে একবার ছুটী দাও—আমার মাসীর বড়ই ব্যামো সে আমাকে একবার দেখতে চেয়েছে।

সুষমা তাহার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল এবং তাহার দৃষ্টি হইতে উত্তেজনা বা অনুশোচনার কোন চিহ্নই ধরা গেল না বটে, তবু কতকটা সমবেদনার স্বরেই সে বলিল "তাইত বসন্ত, তা তোমার মাসী আছে বলেই ত কোন দিন শুনিনি ?

বসন্ত কিছু একটা জবাব দিতে যাইতেছিল—কিন্তু সে কথা কহিবার আগেই সুষমা পুনরায় বলিল তা' এ সময় যাওয়া উচিত বইকি ? কিন্তু কবে আসতে পারবি—তা' ব'লে যা বসন্ত—তোকে না হ'লে আমার চ'ল্‌বে না—সেটা ত' তোর জান্‌তে বাকী নেই বাপু ?"

"কিন্তু কি ক'র্ব্ব মা"—বলিয়া বসন্ত আরও কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু সুষমা তাহাকে একটা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল "মা মা করিসনে বাপু—মা হ'তে আমার দায় প'ড়েছে—এই চাবী নিয়ে ছোট বাক্সটা থেকে দশটা টাকা বের ক'রে নিয়ে যা, দশ দিনের বেশী ছুটী পাবি না তা' ব'ল্‌ছি বলিয়া চাবীর গোছাটা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিতে বলিতে গেল—তোমার আর ছুটী নেবার সময় হ'ল না। আমারও মরণ নেই, তোমাদের হাত

থেকে—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে অদৃশ্য হইয়া গেল। বসন্ত আর কিছু শুনিতে পাইল না। কিন্তু যাহা শুনিয়াছিল, তাহার জন্য তাহাকে কিছুমাত্র দুঃখিত বা চিন্তিত বলিয়া বোধ হইল না।

(১৭)

দাসী হইলেও বসন্ত চিরদিন শুধু দাসীই ছিল না—ভদ্র গৃহস্থের সে একদিন এক সুনিপুন গৃহিণীই ছিল—আর দারিদ্র্য তাহার যতখানিই থাক্ সে গৃহের শত অভাব অভিযোগের মাঝেও তাহার নিপুনতা তাহার ক্ষুদ্র গৃহস্থালীকে শ্রীসম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু বিধাতা তাহাকে সংসার করিতে দিলেন না—এককালে তাহার স্বামীকে ও একমাত্র পুত্রকে টানিয়া লইয়া সংসারকেই শুধু শ্মশান করিলেন না—এই নারীর সংসার কল্পনাকেও বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। তাই পরিণত যৌবনেই তাহাকে দাসীবৃত্তি করিতে বাহির হইতে হইয়াছিল—শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই নহে—একদিনকার প্রতিষ্ঠিত গৃহের নির্জ্জনতা ও রক্ষকহীনতা এই নারীকে গৃহে তিষ্ঠিতে দেয় নাই বলিয়া। কিন্তু দাসীবৃত্তি করিতে আসিয়াছিল বলিয়া সে সাধারণ দাসীর মতই ছিল না, তাই প্রভুর মঙ্গলের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করিয়া দিতে তাহার কোথাও বাধিত না।

এলাহাবাদের সেই নির্জ্জন কুটীরে অত্যন্ত নিম্ন অবস্থায় সে যখন সুষমার হারান' স্বামীর সন্ধান পাইয়াছিল—তখন প্রভুকে ফিরাইয়া পাইবার প্রধান অন্তরায় মুনিয়ার গতিবিধি সে এমনই সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়াছিল—আর তাহার ইতিহাস এমনই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া লইয়াছিল, যে কোন্ দিক হইতে কোন্খানে আঘাত করিলে তাহার নিজের উদ্দেশ্য সফল হইবে—তাহা এই অতিসতর্ক রমণীর বুঝিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই।

তাই সুষমাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিয়া অবধি সে সুযোগ খুঁজিতেছিল, আর তাহার কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাহাকে নানা রূপ দিয়া ফলের আকার অনুমান করিতেছিল—আর যেদিন তাহার এই সঙ্কল্প একটা কল্পিত মীমাংসায় আসিয়া পৌছিল—সেই দিনই সে ছুটীর আবেদন করিল—আর এমনই ভাবে তাহা পেশ করিল যে, তাহাকে ব্যর্থ করিয়া দিবার সামর্থ্য কাহারও রহিল না।

বসন্ত চলিয়া গেল; ছুটী তাহার কিসের জন্য প্রয়োজন—তাহা কেহই বলিতে পারে না। কারণ বসন্ত'র কোন মাসী ছিল কিনা—থাকিলেও তাঁহার সত্যই পীড়া হইয়াছিল কিনা—আর হইলেও তাহা সাংঘাতিক কি না, এবং বসন্ত'র সেজন্য মাথাব্যথা ছিল কিনা, তাহা একমাত্র সে'ই জানে—আর বোধ হয় জানেন ভগবান্। কারণ

এই বসন্ত'র কার্য্যগুলার পদ্ধতি ও প্রবৃত্তি উপরের সেই সর্ব্বদ্রষ্টা আর নীচে বসন্ত নিজে ভিন্ন আর কেহই জানিত না। সে কখনও কাহারও অনিষ্ট করে নাই—বরং পরের ইষ্টের জন্য তাহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে দেখা গিয়াছে। আর সুষমার জন্য তাহার শুভাকাঙ্ক্ষার সত্যই অন্ত ছিল না, আর সে কথা জানিতে তাহাদের পরিচিত কাহারও বাকী ছিল না। তাই বসন্ত'র প্রয়োজন যাহাই থাকুক—তাহাকে নিষেধ করিতে কেহই চাহিল না।

বসন্ত কিন্তু তাহার যে পথে বাড়ী—সে পথের ধার দিয়াও গেল না—বরং ঠিক তাহার উল্টা পথে রাণীগঞ্জের এক খনির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল—কিন্তু কেন করিল তাহা সেই জানে। সেখানে তাহার আর যে কেহই থাকুক—মাসী যে ছিল না, সে বিষয়ে বোধ করি অসংশয়ে মত প্রকাশ করা যায়।

পরদিন প্রভাতের আলো ধরিত্রীর অঙ্গে পুলক স্পর্শ দিয়াছে, ফুলকুল তাহাদের ওষ্ঠাধরে হাসির রাশি লইয়া ধরণীকে আকুল করিতে সুরু করিয়াছে—খনির কার্য্য যথারীতি আরম্ভ হইয়া গেছে—এমনই সময়ে বসন্ত আসিয়া খনির দ্বারপথে দাঁড়াইল—আর প্রথমেই যে কুলীটাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল যে নন্দু নামে যে কুলী এখানে কাজ করে সে কোথায়?

কুলীটা সত্যই বিস্মিত হইয়াছিল—ভদ্র বংশীয় বাঙ্গালী কোন

স্ত্রীলোক একাকী এভাবে এখানে আসিতে পারে তাহা এতকাল পর্য্যন্ত সে কোন দিন দেখে নাই। বোধ করি এই সত্যটা তাহার কল্পনার অতীত ছিল, তাই সে অতিমাত্র বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আর একটা কুলী রমণী সেই পথ অতিক্রম করিতেছিল, বসন্ত তাহাকে এই একই কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর করিল যে, নন্নু নামে কুলী এখানে একজন নাই অনেক আছে, কোন্ নন্নুকে বসন্ত চাহে—তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার—নহিলে এই কয়লার খনিতে কোন নন্নুকেই সে খুঁজিয়া পাইবে না।

কিন্তু বসন্ত যখন বলিল যে, মুনিয়া নামে যাহার স্ত্রী পলাইয়া গিয়াছে—আমি সেই নন্নুকেই চাই—তখন সেই কুলীরমণীটা ঈষৎ হাস্য করিয়া পার্শ্বস্থিত কুলীটাকেই দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল—যাইবার কালে সে বারংবার সুষমার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে লাগিল; নন্নু ও মুনিয়ার জন্য এই রমণীর এত মাথা ব্যথা কেন—তাহা জানিবার জন্য তাহার কৌতূহলের অবধি ছিল না।

(১৮)

এই মুনিয়ার জীবনের ক্ষুদ্র একটা ইতিহাস ছিল। সে কোন দিন নন্নুকে বিবাহ করিয়াছিল বলিয়া শুনা যায় নাই—কিন্তু নন্নুর সঙ্গে তাহার প্রেম অনেক বিবাহিতা স্ত্রীর চেয়েও বেশী ছিল—সে কথা ও অঞ্চলের কুলি মহলে কাহারও অজানিত ছিল না। এই মুনিয়া যেদিন যৌবনে প্রথম পদার্পণ করিতে যাইতেছিল—ঠিক সেই সময়েই একদিন নন্নুর সঙ্গে তাহার দেখা। তারকা-খচিত নীল আকাশ তলে নয়—নদীতীরে, কুঞ্জবনে, এমন কি একটা ছায়া শীতল বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষের তলেও নয়; হাসির ভিতর দিয়া, সঙ্গীতের ভিতর দিয়া, চাহনি ও ভঙ্গিমার ভিতর দিয়া এই দুই নরনারীর প্রাণের বিনিময় হয় নাই—হইয়াছিল প্রখর রৌদ্রে একটা তপ্ত খাটিয়ার উপর শুইয়া করুণ আর্ত্তনাদের মধ্য দিয়া। তাহারই কিছুদিন আগে নন্নু খনির কাজ করিতে গিয়া অত্যন্ত আহত হয় এবং খনির মধ্যে আগুন হইয়া তাহার শরীরের কিয়দংশ পুড়িয়া যায়। তাহার সঙ্গীরা অবশ্য তাহার শুশ্রূষা করিত না এমন নয়—কিন্তু তাহারাও পরের চাকর—সুতরাং কাজের সময় তাহারা রোগীর পরিচর্য্যা করিতে পারিত না

এমনই ভাবে একদিন সঙ্গীরা যখন কাজে চলিয়া গেছে, আর শয্যাগত অবস্থায় নন্নু যেখানে শুইয়াছিল সেখানে প্রখর রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে—আর বেচারী নন্ন রোগের জ্বালায় ও রোদের জ্বালায় করুণ আর্ত্তনাদ করিতেছে—এমনই সময়ে মুনিয়া কয়েকটী সখী লইয়া সেখান দিয়া যাইতেছিল, নন্নুকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া সখীদের কেহ উপহাস করিয়াছিল—কেহ কটূক্তি করিয়াছিল কেহ বা দুঃখ প্রকাশ পর্য্যন্ত করিয়াছিল—করিয়া চলিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু এই মুমূর্ষুকে সেবা করিতে অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু মুনিয়ার ভিতরে একটা সত্যিকারের নারীর প্রাণ ছিল—সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। রোগীর খাটিয়াখানা ছায়াতলে লইয়া আসিয়া আর্ত্তকে শুশ্রূষা করিয়াছিল। আর তাহারই সেবার আশীর্ব্বাদে নন্নু যেদিন সুস্থ হইয়া উঠিল—সেদিন আর মুনিয়াকে ছাড়িয়া দেয় নাই—নিজেরই করিয়া লইয়াছিল—আর মুনিয়াও তাহাতে আপত্তি করে নাই।

কিন্তু একঘরে ঘর করিতে গেলে—সেখানে শুধু নিছক ভালবাসারই প্রত্যাশা করা যায় না ; একই আকাশের বক্ষে পূর্ণিমা ও অমাবস্যার আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাই প্রায় পাঁচবৎসর ঘর করিয়াও পূর্ণিমার স্থানে মাঝে মাঝে অমাবস্যাও দেখা দিতে লাগিল—আর সামান্ত একটা ঘটনা হইতে তাহাদের বিচ্ছেদ একেবারে সম্পূর্ণ হইয়া গেল।

(১৯)

সেও এমনই এক শুশ্রূষার ব্যাপার লইয়া। এমনই এক অসহায়কে দিনের পর দিন সেবা করিতে দেখিয়া নন্নু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মুনিয়াকে একদিন অত্যন্ত প্রহার করে—আর তাহা হইতেই যে অনর্থ কাণ্ড ঘটিয়া যায়, তাহারই উত্তেজনার ফলে মুনিয়া নন্নুকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিন্তু পথে বাহির হইয়া পথশ্রমে এবং সময়ের ব্যবধানে উত্তেজনা যখন অবসাদে পরিণত হইল, আর মন যেদিন নিরতিশয় উদাস হইয়া গেল—সেই দিনই সন্ধ্যাকালে নদীতীরে শ্মশানে মৃতপ্রায় বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে মুনিয়ার দেখা হইল।

তারপর দুটা আহত মনই যেদিন আহত দেহ লইয়া পরস্পরের সঙ্গে সাম্মিলিত হইল—সেদিন তাহারা কোথায় গিয়া মিশিবে—কতদূর যাইলে তাহাদের বিদ্রোহ-প্রবৃত্তির অবসান হইবে—তাহা মন লইয়া যিনিই কিছুদিন তোলপাড় করিয়াছেন—অনুমান করা তাঁহারই সম্ভব। মার দুজনেই খাইয়াছিল—সুতরাং যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা উভয়েরই মনে মনে রহিয়া গেছে—কিন্তু শক্তিতে কুলায় নাই বলিয়াই মনের ক্ষাত্রধর্ম্ম এতদিন চাপা পড়িয়াই ছিল—কিন্তু দুটা বিদ্রোহী মন যেদিন এক সঙ্গে মিশিল—সেদিন মনের ধর্ম্ম সাধিতে

মন ছাড়িল না ; কখন যে তাহাদের উভয়েরই অজ্ঞাতসারে একবারে আত্মবিনিময় করিল—তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

তাহারা বুঝিতে পারিল না সত্য, এবং বুঝিতে পারিলেও তাহাদের হয়ত ফিরিবার পথ ছিল না—একথাও মিথ্যা নহে—এবং তাহাদের মিলনে অন্য কাহারও স্বার্থ হানি না হইলে হয়ত' তাহাদের মিলন চিরদিন না হউক—আরও কিছুদিন অটুট থাকিয়া যাইত, একথা মনে করাও অসম্ভব নয়। কিন্তু সুষমা ও বসন্ত'র তাহাতে ক্ষতি হইতেছিল—তাই তাহারাও বাহির হইয়াছিল—তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে, আর বীরেশ্বরকে তাহাদের আয়ত্বের মধ্যে আনিবার জন্য চেষ্টাও করিতেছিল। তাই বসন্ত আসিয়া নন্নুকে ধরিল—আর তাহার স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য উত্তেজিত করিতেও ত্রুটী করিল না। কিন্তু নন্নু যখন বলিল যে, তাহাদের সর্দ্দারের অনুমতি না পাইলে সে যাইতে পারিবে না—এবং যাইলে তাহার চাকরী যাইবে—তখন অগত্যা বসন্তকে তাহাদের সর্দ্দারের কাছ পর্য্যন্ত যাইতে হইল। কারণ সে যে কাজ করিতে বাহির হইয়াছিল—তাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া যাইলে এত পরিশ্রম সবই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুষমার জীবন ব্যর্থ হইবে—তাহার এতদিনকার চেষ্টা সফল হইবে না। কিন্তু কে এই সর্দ্দার এবং বসন্ত তাহার কার্য্যের কিরূপ কৈফিয়ৎ দিবে—তাহারই একটা খসড়া মনে মনে

করিয়া লইয়া সে যখন সর্দ্দারের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন আতমাত্র বিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে, এই সর্দ্দার তাহাদেরই অতি পরিচিত তিনকড়ি।

কিন্তু এই পরিচিতের যে পরিচয় সেও তাহার প্রভুপত্নী সুষমা পাইয়াছে তাহার সম্বন্ধেও যেমন কিছুই বলিবার নাই, আজ এই দূর দেশে এই পরিচিতের পরিচয় বন্ধনের মধ্যে পড়িয়া পরিচয় করিবার মত ইচ্ছাও তাহার ছিল না। এমন কি ইহার মধ্যে মহত্ত্ব ও প্রভুভক্তি তাহার যতখানিই থাক—তিনকড়ি যে ইহার কদর্থ করিবে এবং এই ঘটনা হইতে কতখানি লজ্জাকর গল্প রচনা করিবে—তাহাও বুঝিতে তাহার বাকী ছিল না। কিন্তু ভবিষ্যতে যাহা হইবার তাহাত' হইবেই, কিন্তু সম্মুখে যে বিপদ উপস্থিত হইল—তাহাকে অতিক্রম করিতে যে একটু বেগ পাইতে হইবে—এমন কি একটু কৌশল করিতে হইবে, অনিচ্ছা থাকিলেও বাধ্য হইয়া বসন্তকে এই কার্য্য করিতে হইবে, তাহাও তখনই সে স্থির করিয়া লইল। তাই সম্মুখে তাহাকে দেখিয়া তিনকড়ি যখন অতিমাত্র বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "কি বসন্ত যে এখানে?"

বসন্ত প্রায় গম্ভীর হইয়াই উত্তর দিল "হাঁ তিনকড়ি বাবু আপনার এই কুলীটিকে দুই চার দিনের জন্য একবার ছেড়ে দিতে হবে—আমার একটু কাজ কর্ব্বে।

তিনকড়ি আরও বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল "কে ? এই কুলী ? এ তোমার কি কাজ কর্ব্বে বসন্ত ?

"গরীবের কাজ তিনকড়িবাবু, দয়া করে একে ছুটী দেবেন কি ?"

কি কাজ না জানলে ছুটীর কথা কি ক'রে বলি বসন্ত। আমি যে বুঝিতে পাচ্ছি না—বলিয়া বোধ হয় সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল। বসন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উত্তর করিল যে, ওর স্ত্রী মুনিয়া এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে এলাহাবাদে আছে, তার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল—তাই একে খবর দিতে এসেছি ; কিন্তু ও মূর্খটা আপনার অনুমতি ভিন্ন ওর যুবতী স্ত্রীটাকে আনতে যেতে চায় না। এই পর্য্যন্ত বলিয়া বসন্ত একটু হাসিল—নন্নুর স্ত্রী যে যুবতী এই কথাটা তিনকড়িকে শুনাইয়া দেওয়া তাহার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু তিনকড়ি তাহাতে ভুলিল না। প্রশ্ন করিয়া বসিল, তোমাদের জমিদারণী কেমন আছে বসন্ত ? ওকি ? তুমি দাঁড়িয়ে রৈলে কেন ভাই—এইখানে এসে বস না—এই নাও আমি স'রে যাচ্ছি—বলিয়া সে একটু নড়িবার চেষ্টা করিল।

বসন্ত নড়িবার চেষ্টাও করিল না—সেইখানে দাঁড়াইয়াই জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কতদিন এখানে এসেছেন ?"

তোমরা ত আর আমাকে অন্ন দিলে না বসন্ত—কি করি দু'পয়সা রোজগার কর্ত্তে হবে ত ?

বসন্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল "তা বেশ করেছেন, আমরা চাকর-বাকর মানুষ—আমাদের কি হাত তিনকড়িবাবু ?"

তোমার খুব হাত বসন্ত আমি তোমাকে 'পাঁচশ' টাকা দেব' তুমি যদি আমায় একটু দয়া কর—বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল সুষমা ত তোমার কথায় ওঠে বসে—বলিয়া কিসের একটা ইঙ্গিত করিয়া হাস্য করিল।

এই ইঙ্গিতে বসন্ত হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেও এইবার যে একটা কৌশল করিতে হইবে—তাহা বুঝিতে ভুল করিল না। তাই নিজেও সে অধরে মৃদুহাস্য তুলিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল "এখন আর আমায় টাকা দিতে হবে না—বলিতে বলিতে বোধ হয় লজ্জাতেই তাহার মাথাটা হেঁট হইয়া গেল—সেই অবস্থাতেই কি একটা ভাবিয়া লইয়া সে আবার বলিল "কিন্তু কার যে কত দরদ তা' আর বুঝতে কারও বাকী নেই তিনকড়িবাবু।"

তিনকড়ি একবারে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল "তাহলে তুমি এই জন্যই এসেছ বসন্ত, তোমাকে আমার অদেয় কিছু নাই—কি চাও বল ?

বসন্ত হাসিয়া বলিল—কিছু চাই না বাবু—এই কুলীটাকে দুদিনের জন্য ছেড়ে দিন—

তিনকড়ি সোৎসাহে বলিয়া উঠিল "দুদিন কেন বসন্ত, আমি

তা'কে দশদিনের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি কিন্তু আমার উপায় কর।

বসন্ত হাসিয়া উত্তর করিল আপনার উপায় আমি কি ক'র্ব্ব তিনকড়ি বাবু, বড়লোকের ব্যাপারে গরীব মানুষকে টানবেন না আপনি নিজেই চেষ্টা করুন না।"

তুমি ভরসা দিচ্ছ ত? তুমি ভরসা দিচ্ছত' বসন্ত বলিয়া তিনকড়ি আসন ছাড়িয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

বসন্ত'র ইচ্ছা হইতেছিল যে পদাঘাত করিয়া এই লম্পটকে তাহার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দেয়, কিন্তু তাহাতে তাহার কার্য্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে বলিয়াই সে একেবারে হাত জোড় করিয়া অত্যন্ত বিনীত ভাবে উত্তর দিল, আমাকে বলবেন না বাব আপনাকে একটু চেষ্টা ক'র্ত্তে হবে, বড়লোকের কথা—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে কণ্ঠস্বরের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া যেন অতি ব্যস্ত ভাবে বলিল "কিন্তু আমার নাম যেন মুখে আন্‌বেন না বাবু, আমি অতি গরীব লোক দেখ্‌বেন আমি যেন মজি না।

বাহিরে আসিয়া বসন্ত মনে মনে বলিল "ভগবান, আমি আজ যাহা করিলাম মানুষের চক্ষে তাহা অত্যন্ত হীন কৃতঘ্নতা, কিন্তু তুমিত' দেখিতেছ প্রভু যে, সুষমাকে ঘর হইতে বাহির করিতে না পারিলে তাহার স্বামীর সঙ্গে মিলন হইবে না। আমার সদুদ্দেশ্যের

মধ্যে যদি কোথাও কিছু ভুল করিয়া বসি, হে প্রভু, হে দয়াময়, তুমি তার জন্য আমায় মার্জ্জনা করিও।

(২০)

দয়াময় প্রভু বসন্তকে মার্জ্জনা করিবেন, তাহা বোধ হয় অসংশয়ে বিশ্বাস করা যায়; কারণ পরহিতে অন্যায় করিলেও বিচারকের চক্ষে তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু যাহার জন্য বসন্ত এই সমূহ কষ্ট স্বীকার করিতেছে, তাহাকে সহজে নিষ্কৃতি দিবেন বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। কারণ বিবেকের দংশন যদি ঈশ্বরের দেওয়া শাস্তি বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে এই নারীর শাস্তি বহুদিন আরম্ভ হইয়া গেছে। কারণ না থাকিলে কার্য্য হওয়া সম্ভব নয় ইহা সত্য বটে, কিন্তু কার্য্যও ক্ষুদ্র হউক কি বৃহৎই হউক তাহার একটা ফল প্রসব করে ইহাও মিথ্যা নয়। স্বামীকে দূর করিয়া দিয়া কোন নারী সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয় কিনা জানা নাই, কিন্তু সুষমা তৃপ্ত হইতে পারে নাই তাহা এই রমণীর এলাহাবাদ যাওয়া উপলক্ষ্যে ধরা পড়িয়া গেছে। কিন্তু তবু তাহার প্রচ্ছন্ন বেদনা রাশি বসন্ত'র প্রলাপের প্রলেপ দিয়া ঢাকা ছিল বলিয়া এতদিন সহ্য করিবার সীমা অতিক্রম করে নাই। কিন্তু বসন্ত যখন চলিয়া

গেল এবং প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে ফিরিয়াও আসিল না, তখন নীরবে নির্জ্জনে সুষমার শূন্য প্রাণ যে চিন্তার অবসর পাইল তাহাতেই তাহার দুঃখ ও বেদনা অত্যন্ত বড় হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। এমন কি যে মুনিয়াকে স্বামীর সঙ্গিনী দেখিয়া সে ক্রোধভরে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল তাহাকেই বীরেশ্বরের সত্যকার প্রণয়িণী বলিয়া মনে করিতেও কুণ্ঠিত হইল না।

নারী নাকি সব সহিতে পারে শুধু স্বামীকে অন্যের হাতে সঁপিয়া দিতে পারে না; ইহা সত্য কিনা জানি না, কিন্তু যদি সত্যও হয় তাহা হইলে সুষমা এই জাতির নারী হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু তবু এই নারীর ভিতর নারীত্ব যে একেবারে মরিয়া যায় নাই—তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়িল তাহার আর একদিনের আচরণে।

সে একদিনকার মনোরম সূর্য্যাস্তকালে, মেঘান্তরিত সূর্য্যের অস্পষ্ট আলোকে ধরিত্রীর বক্ষ তখনও স্বপ্নোজ্জ্বল ও স্বপ্নোজ্জ্বল বলিয়া মনে হইতেছিল, শীতল বাতাস শরীরে যে শিহরণ জাগাইতেছিল তাহাতে সূর্য্যালোকের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় মেঘের বর্ষণ সূচনাই করিতেছিল না—প্রিয়তমদের বিচ্ছেদ বেদনা ও বাতাসের হর্ষে স্পর্শে দেহের ভিতর দিয়া মরমে গিয়া নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল। আর পুষ্পের সুরভি অতীতদিনের কাহিনীগুলা কন্দর্পের গুপ্ত-চরের মত মনের মাঝে বর্ত্তমান করিয়া দিতেছিল। আর তাহাদের

মাঝখানে সুষমা বসিয়াছিল তাহার ছাদের একান্তে, একান্ত একাকী, তাহার অন্তরের নিভৃত প্রান্তে কতখানি মেঘ করিয়াছিল বলা যায় না, কিন্তু বাতাস যে তাহার অঞ্চল প্রান্ত লইয়া অত্যন্ত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছিল—সেদিকে তাহার দৃষ্টি দিবারও অবকাশ ছিল না।

এমনই সময়ে পাড়ার একটি মেয়ে কালী আসিয়া ছাদের উপর বসিল, আর সুষমাকে দুই একটী সামান্ত প্রশ্ন করিয়াই অঞ্চল হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল, দিয়াই সলজ্জভাবে বলিল সুষমাদিদি, আমার একখানি চিঠি লিখে দিতে হবে।

সুষমা একটু হাসিয়া বলিল, তাহলে নীচে চল এখানে ত দোয়াত কলম নেই।

কালী বলিল আমি দোয়াত কলম তোমার ঘর থেকে এনে দিচ্ছি, এইখানেই ব'স ; নীচে আমার লজ্জা কর্ব্বে। বলিয়াই উঠিয়া গেল। তাহার কোলের ছেলেটা সুষমার কাছেই বসিয়া রহিল। সুষমা এই ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু পরক্ষণেই চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া স্থির হইয়া বসিল পাছে, তাহার এই অকারণে অশ্রুবিন্দুগুলা কালীর চোখে পড়িয়া যায়।

এই কালীর সঙ্গে সুষমার আলাপ ছিল শৈশব হইতে। এক পাড়াতেই তাহাদের বাড়ী সুতরাং তাহাকে শৈশব সঙ্গিনী বলিলেও

অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সুষমার অল্প কয়েকটী সঙ্গিনীর মধ্যে অবস্থার পার্থক্যে দেখা শোনা বড় একটা কাহারও সহিত হইত না। কারণ তাহাদের প্রত্যেকেই স্বামীর গৃহে চলিয়া গিয়াছে ; অল্প কয়েকদিনের জন্য তাহারা যখন আসিত তখন জমীদার বাড়ীর দেউড়ি পার হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে কাহারও সাহস হইত না সুতরাং দেখাও বড় একটা হইত না।

কিন্তু বসন্ত চলিয়া যাইলে সুষমা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে দেবমন্দিরে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময়েই একদিন সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের মন্দির প্রাঙ্গণে পুরাতন সখী কালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সেই দিন হইতে কতকটা সুষমার আগ্রহেই কালী প্রায় প্রত্যহই আসিত—আর আসিলেই প্রায়ই স্বামীর কথা হইত। এই মেয়েটা কোন ক্রমেই স্বামী-প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া থাকিতে পারিত না— মাঝে মাঝে স্বামীর কথা কহিতে কহিতে সে এমনই তন্ময় হইয়া যাইত যে, সুষমার চক্ষু যে কতবার সজল হইয়া উঠিত আর কতবার সে গোপনে চক্ষু মুছিত—তাহা লক্ষ্যই করিত না।

কিন্তু সুষমা কোন দিন কালীকে তাহার অতিপ্রিয় গল্প বলার সুখ হইতে বঞ্চিত করে নাই—ক্ষুধিতের মত অপরের প্রেমের কথা-গুলা সে কান দিয়া অন্তরস্থ করিত, তাহাতে ক্ষুধা মিটিত না বটে— এমন কি দুর্লভ দ্রব্যে আকাঙ্ক্ষাই জন্মিত—কিন্তু যে বস্তু সে উপেক্ষা

করিয়া হেলায় হারাইয়াছে—তাহা অন্তে কি করিয়া কত যত্ন করিয়া উপভোগ করে—তাহা দেখিবার ও শুনিবার লোভ সামলাইতে কিছুতেই পারিত না।

এইরূপে বসন্ত থাকিতে যে ক্ষতে প্রায়ই প্রলেপ পড়িত—তাহাই বসন্তর অনুপস্থিতি কালে নিত্য বাড়িয়া যাইতে লাগিল—আর সুষমা নিত্য অশ্রুজলে নৈশ উপাধান অভিষিক্ত করিতে লাগিল।

কিন্তু সে যাহাই হউক—কালী নীচে হইতে দোয়াত ও কলম আনিয়া সুষমার সম্মুখে রাখিয়া বলিল—"তিনি ভাই রাগ ক'রেছেন—এমন ক'রে চিঠি লিখে দাও যে তাঁর রাগ প'ড়ে যায়।"

সুষমা কষ্টে হাসিয়া বলিল "আমি কি কখন স্বামীকে চিঠি লিখেছি কালী—যে তার মনের মত ক'রে লিখে দেব'—তুমি ব'লে যাও আমি লিখে দিই।"

কালী হাসিতে হাসিতে বলিল -আমি মূর্খ মানুষ আমি কি ব'লব' সুষমা দিদি—তুমি আমার মনের কথা বুঝে লিখে দাও—তিনি রাগ ক'রেছেন—তিনি বলেন মেয়ে মানুষ স্বামীর কাছে না থাক্‌লে বিপদে প'ড়তে পারে। তুমি লিখে দাও যে, আমাকে যেদিন তিনি যেতে ব'লবেন আমি সেই দিনই হাজির হব।

এই সব মেয়েরা যাহা বলে তাহার সঙ্গে সুষমার জীবনের কত বড় পার্থক্য—তাহার চারি পার্শ্বেই যে নারীত্বের সন্ধান সে দিবা

রাত্রই পাইয়া থাকে—তাহার মাঝখানে কতবড় একটা গণ্ডী টানিয়া দিয়া সে নিজের নিজত্বের রাজ্যে বাস করিতেছে—তাহা এই মুহূর্ত্তে সুষমার মনে উদয় হইয়াছিল সত্য—কিন্তু অন্তরের এই বিদ্রোহকে সে একেবারেই দমন করিয়া ফেলিয়া চিঠির কাগজখানা হাতে লইয়াই মুখ তুলিল—মুখ তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা কালী চিঠির উপরে কি লিখব বল দেখি? বলিয়াই মৃদু হাসিল।

কালী রাগিয়া উঠিয়া বলিল—যাও তুমি ভারি দুষ্টু সুষমা দিদি—কি লিখতে হয় জান' না যেন? বলিতে বলিতেই সে কাঁদিয়া ফেলিল—আর সেই অবস্থাতেই বলিল, আমি লেখা পড়া জানিনা ব'লে আমার কি অবস্থাই তোমরা কর।

কালীকে কাঁদিতে দেখিয়া সুষমা অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল—কিন্তু স্বামীকে চিঠি লেখা যে তাহার কোন কালে অভ্যাস নাই—কি কথা লিখিলে এই স্বামীর জাতি সন্তুষ্ট হয়—তাহা সুষমার যে কোন কালেই জানা নাই—বরং কি করিলে সন্তুষ্ট হয় না তাহা ভালই জানা আছে—সে কথা সম্মুখের ঐ ক্রন্দনরতা মেয়েটাকে বলিয়া কোন লাভ নাই দেখিয়া সে কতকটা গম্ভীর হইয়াই কলম তুলিয়া লইয়া চিঠি লিখিতে বসিল—নিজের স্বামীকে যে কোনও পত্র দেয় নাই—তাহাকেই পরের হইয়া পরের স্বামীকে পত্র লিখিতে হইল।

কিন্তু এই সময়েই কি ছাই নিজের যত বেদনা রাশি—নিজের স্বামী-বিরহিত জীবনের কল্পনা রাশি মনের মধ্যে আসিয়া দ্বন্দ্ব বাধাইয়া বসিল? কি হইলে সে এমনই করিয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে পারিত—কি হইলে এই বকুল-গন্ধ-সুরভিত সমীরে—উপরকার ঐ মেঘ মেদুর আকাশের নীচে এইখানে এই ছাদে বসিয়া সে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতে পারিত—কি হইলে সম্মুখের ঐ কালার কোলে যে ছেলেটা এখনও মাতৃ স্তন্য পান করিতেছে সেও তেমন সন্তানের জননী হইতে পারিত—

কিন্তু এই সময়েই কালী বলিয়া উঠিল মেঘ ক'রে আস্‌ছে সুষমা দিদি, তোমার দুটী পায়ে পড়ি ড় কলম লিখে দাও ভাই।

এই যে দিই কালী—বলিয়া সুষমা পত্র আরম্ভ করিল—কিন্তু এই সময়েই তাহার চক্ষু যে জলে ভরিয়া গিয়াছিল—ঘাড় হেঁট করিয়া ছিল বলিয়াই বোধ হয় কালী তাহা দেখিতেও পাইল না; কিম্বা স্বামী প্রেম ও সন্তান স্নেহ এই অনক্ষরা মেয়েটাকে হয়ত' তখন এতই বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, যে সৌজন্যের এই সব ক্ষুদ্র অঙ্গ হানি তাহার চোখেই পড়িল না।

পত্র সমাপ্ত হইলে সুষমা বলিল, শোন্ ভাই, আমরা ভাল লিখতে জানি না—সাদা কথায় চিঠি লিখেছি—তোর মনের কথা হ'য়েছে কি না জানিনা। এই বলিয়া পত্র পড়িল।

প্রিয়তম !

তোমার পত্র পাইয়াছি—তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ—আমি যদি দোষ করিয়া থাকি, দাসী বলিয়া মার্জ্জনা করিও—আমি পদাশ্রিতা লতা তুমি বিরূপ হইলে আমি বাঁচিব কি করিয়া ? তুমি ত' কখনও আমার উপর রাগ করিয়া থাকিতে পার না, আমি আজ দূরে আছি বলিয়া কি বিরক্ত হইয়াছ ? দূরে আছি বলিয়া আমি যে তোমার অভাব শতগুণে বোধ করিতেছি। দূরে আছি বলিয়া রাগ করিও না—দূরেই থাকি আর কাছেই থাকি, আমি যে তোমারই—তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ ? তুমি কেমন আছ—পারত' একবার আসিও—না পার—যেদিন তুমি হুকুম করিবে—সেই দিনই তোমার পদপ্রান্তে পৌঁছিব।

তোমার একান্ত পদাশ্রিতা কালী—

পত্র পাঠ হইলে কালী সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল—মেয়েমানুষ নাকি মেয়ে মানুষের মন বোঝে না—দাও—না আর দেখতে দেব' না—জল এসে প'ড়ল যাই—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

(২১)

উপরে মেঘ গর্জ্জন করিতেছিল—ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎও প্রকাশ পাইতেছিল—তবু সেই অন্ধকারে—সেই মেঘদলাকুলিত আকাশের নিম্নে সুষমা ছাদের উপর শুইয়া পড়িল। দুরন্ত বাতাস তাহার অঙ্গে গণ্ডে অধরে আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল; তাহার ধুলা-লুণ্ঠিত অঞ্চলকে চঞ্চল করিয়া তুলিল—তবু সুষমা সেই একই স্থানে পড়িয়া রহিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল ঐ যে মেয়েটা স্বামীর উপর নির্ভর করিয়া পরম নিরুদ্বেগে কাল কাটাইতেছে—স্বামীর পদে আজীবন দাসত্ব গ্রহণ করিয়াও কোন অংশেই অপরিতৃপ্ত নহে—ঐটাই নারীর প্রশস্ত পথ; সংসারের শত ঝঞ্ঝা হইতে দূরে থাকিয়া বিশাল মহীরুহের পদ প্রান্তে আপনার নিভৃত আশ্রম গড়িয়া লওয়া নারীর মত দুর্ব্বল জাতির পক্ষেই অত্যন্ত শোভনীয়—সংসারের পাপ তাপ স্কন্ধে বহিয়া শত নিন্দার ভাগী হইয়া পুরুষের সমকক্ষ হইতে যাওয়া ও চাওয়া আর যাহারই পক্ষে শোভনীয় হউক—সুষমা যে জাতীয়তার বিশাল প্রাসাদতলে গড়িয়া উঠিয়াছে—সেখানকার জন্য নয়। তাহার বৃদ্ধা পিতামহীরা যে সাবিত্রী হইবার লোভেও গৌরবে কোনরূপ আত্ম-বিসর্জ্জনকেই ভয় করিতেন না—ব্রত ও উপবাস

গৃহাশ্রম ও স্বামী সেবা লইয়া সেকালের নিরক্ষরা নারীগুলার জীবনের অর্দ্ধেক দিন যে অনাহারেই কাটিয়াছে, তাহার প্রমাণ আজিকার বৃদ্ধা নারীদের মধ্যেও যথেষ্ট পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাদের জীবন যে দুঃখে কাটিয়াছে—এমন গল্প ও উপন্যাস পর্য্যন্ত সুষমা একখানিও পড়ে নাই।

তবু সে যে আজ এই অসীম অশান্তির পাদমূলে আত্ম বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছে, এ যে কোন কুল হইতে প্রাপ্ত সংস্কারের বলে—তাহা আজ পর্য্যন্ত সুষমা ভাবিয়া পায় নাই; তথাপি এই নারী বিশ্বনারীত্বের যতটা সন্ধান পাইয়াছিল—তাহার সবটাই যে স্বামীকে সম্মুখে রাখিয়া গৃহাশ্রম গড়িয়া তোলা—নূতন শিক্ষার নূতন নূতন সংস্করণে এই সত্যের যতগুলা সংস্করণই হইয়া থাক্—তাহার মূল তথ্য যে এখনও একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহার পরিচয় চেষ্টা করিলেই পাওয়া যায়—ইহাও তাহার অবিদিত ছিল না। অবিদিত ছিল না যে, যেখানেই নরনারীর সম্মিলনে শান্তিময় গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে সেখানেই একজনকে আর একজনের বাধ্য হইতে হইয়াছে এবং পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই সর্ব্বজাতির মধ্যে তাহার পরিচয় পুনঃপুনঃ পাওয়া গিয়াছে। কারণ পৌরুষের জন্ম হইয়াছিল জয় করিতে, আর স্নেহের জন্ম হইয়াছিল পালন করিতে। আর এই দুই শক্তি যেখানেই পরস্পর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইখানেই জয় ও

অসম্ভব হইয়াছে—পালনও নিরর্থক হইয়াছে—আর গৃহযুদ্ধের আর অন্ত রহে নাই।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে সুষমার মনে পড়িয়া গেল যে এই সংসারে সুখ ও দুঃখ পাশাপাশিই চলিয়াছে, একটাকে বাদ দিয়া আর একটাকে পাওয়া যায় না—পাইলেও তাহার সম্যক পরিচয় কিছুতেই পাওয়া যায় না—শুধু দিবসের আলো মানবকে চক্ষুপীড়াই দিত এবং শুধু রাত্রির অন্ধকার পৃথিবীর পক্ষে একেবারে দুঃসহ হইয়া উঠিত। এই সংসারে মানুষ সুখ ও দুঃখকে বরণ করিয়াই ত' জীবনকে হাস্যময় ক্রীড়া ও কৌতুকময় করিয়া রাখিয়াছে—শুধু সেই অন্ধের মত আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে। আজ হইতে সুষমা আর তাহা থাকিবে না—মানুষ হইবে। কালীর এই মাত্র দেওয়া শিক্ষা আর সে ভুল করিবে না—সেও স্বামীর সন্ধানে যাইবে—তাঁহার জীবনের সহযাত্রী হইবে—তাঁহার দুর্গমের সঙ্গিনী হইবে—গান্ধারী যে স্বামীর দৃষ্টিহীনতার জন্য নিজে সারা জীবন অন্ধ সাজিয়া বসিয়াছিলেন—হিন্দুনারীর এই পরম ও চরম শিক্ষার আর সে অপমান করিবে না।

এই সব ভাবিয়া সুষমা যখন উঠিয়া দাঁড়াইল—তখনই তাহার অঞ্চল হইতে কালীর স্বামীর উদ্দেশ্যে লিখিত খামখানা পড়িয়া গেল—আর সুষমা তাড়াতাড়ি তাহাকে ফিরাইবার জন্য নীচে নামিয়া

আসিল। কিন্তু কালী তখন চলিয়া গেছে। তবু সে এখনও বাড়ীর দরজা পার হয় নাই ভাবিয়া সুষমা বাহিরে আসিল, আর বাহিরের বাগানটার মধ্যে আসিয়া বার দুই ডাকিয়াও যখন সাড়া পাইল না তখন ফিরিয়াই যাইতেছিল—সহসা পিছন হইতে কে তাহার বসনাগ্র ধরিয়া টানিতেই সুষমা সচকিতে তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল—আর সেই সময়ে একবার বিদ্যুৎ বিকাশ হইতেই দেখিতে পাইল যে, তাহার সম্মুখে যে দাঁড়াইয়া আছে, সে তিনকড়ি।

---

(২২)

উপরে আকাশ গর্জ্জন করিতেছিল—নিম্নে ধরিত্রী অম্ল বরিষণে অভিষিক্ত হইতেছিল—ক্ষণপ্রভার ক্ষণ-দীপ্তি অন্ধকারকে প্রতি মুহূর্ত্তে নিবিড় করিয়া তুলিতেছিল—আর শীতল বাতাস বাগানের ফুলকুলকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিল—তাই তাহাদের মৃদু গন্ধ মন্দগতি গন্ধবহের সর্ব্বদেহেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল—আর তাহাদের মাঝখানে এই দুই নরনারী দাঁড়াইয়াছিল—একজন ক্রুদ্ধা ফনিণীর মত ফণা বিস্তার করিয়া—অন্যজন সেই ফনিণীকে বশীভূত করিবার যাদু মন্ত্র লইয়া।

বহুদিন পূর্ব্বে এই তিনকড়ি আর এক সন্ধ্যাকালে সুষমার পদস্পর্শ করিয়া তাহাকে যে ইঙ্গিত করিয়াছিল, তাহাতে তিনকড়িকে পদচ্যুত হইতে হইয়াছিল—আর কোন শাস্তির অংশ লইতে হয় নাই। কিন্তু পুনর্ব্বার এতদিন পরে সে যে সাহসে অত্যাচার করিতে সাহসী হইয়াছে—তাহার জন্য তাহাকে কি শাস্তি দেওয়া যাইবে—সুষমা তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। উত্তেজনায় তাহার আপাদ মস্তক মৃদু কম্পিত হইতেছিল—সহজে বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। কিন্তু অধিকক্ষণ এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে পাছে এই দুর্ব্বৃত্ত কোনরূপ দুঃসাহসের পরিচয় দিয়া বসে—তাই সুষমা অতিরিক্ত ক্রোধে চীৎকার করিয়া ডাকিল "তিনকড়ি"

তাহার কণ্ঠস্বরে তিনকড়ি কতকটা দমিয়া গেল বটে—কিন্তু বসন্ত'র ইঙ্গিত স্মরণ করিয়া একেবারে হটিলনা—মৃদুস্বরে বলিল "আমাকে দয়া কর সুষমা"—তথাপি সুষমা কণ্ঠস্বর অবিচলিত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আবার কেন এসেছ?"
মিনতির স্বরে তিনকড়ি বলিল "সুষমা আমি তোমায় ভালবাসি।"

সম্মুখে সর্প দেখিলে মানুষ বোধ করি তত আতঙ্কিত হয় না যত আতঙ্কিত সুষমা হইয়াছিল—সে এই কথা শুনিয়া দ্রুতপদে দুই তিন হাত পিছাইয়া আসিয়া ডাকিল 'দরোয়ান'।

কিন্তু ভয়েই হউক কি বিস্ময়েই হউক—তাহার কণ্ঠতালু এত

শুকাইয়া গিয়াছিল যে, স্বর তাহার কণ্ঠ হইতে বাহিরে আসিল মাত্র—বেশী দূরে যাইতে পারিল না। আর ঠিক এই সময়ে তিনকড়ি যাদু মন্ত্র আওড়াইল—সে বলিল 'দরোয়ানকে ডেক'না সুষমা তা'তে কলঙ্ক বাড়বে বৈ কম্‌বে না—আমাদের দুজনকে এই অন্ধকারে একত্র দেখ্‌লে লোকে কি ভাব্‌বে বলত ?"

কিন্তু অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই স্বামীর চিন্তায় সুষমার প্রাণ পূর্ণ হইয়াছিল—সে চিন্তার সুখপ্রদ শেষ রশ্মিটুকু তখনও তাহার মস্তিষ্কের অভ্যন্তর হইতে অন্তর্হিত হয় নাই—তাই যে কথা শুনিলে প্রত্যেক রমণীই ভয়ে ও লজ্জায় জড়সড় হইয়া যাইত—তাহা সুষমার অন্তর স্পর্শই করিল না। সে সদর্পে উত্তর করিল যে, কি মনে করবে ? লোকে চোরকে গৃহস্বামীর সম্মুখে দেখ্‌লে লোকে যা' মনে ক'রে থাকে—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে বোধ করি 'চোর' 'চোর' বলিয়াই চীৎকার করিতে যাইতেছিল—কিন্তু ঠিক এই সময়ে দূর হইতে একটা আলো আসিতে দেখিয়া তিনকড়ি ধরা পড়িবার ভয়ে পলায়ন করিল। আর ঠিক এই সময়েই ধরা পড়িবার ভয় ও নারীর প্রবল লজ্জা এমনই জোরে আসিয়া সুষমার কণ্ঠরোধ করিল যে সে না পারিল 'চোর' বলিয়া চীৎকার করিতে, না পারিল সেস্থান ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইতে। আর পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎ দীপ্তি-প্রদর্শিত সুষমার শুভ্র বস্ত্রখানার দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া যখন সেই দূরাগত আলোক রেখা

একেবারে বাগানের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল, তখনও তিনকড়ি পলাইতে পারে নাই—এক ঝাড় হেনার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

উপরে বিদ্যুৎ হানিয়া হানিয়া যাইতেছিল—তাহার শুভ্র আলোকে শুধু নিকটেরই নহে—দূরের জিনিষ ও সুস্পষ্ট দেখা যায়—কিন্তু সে ক্ষণপ্রভার সাহায্য না লইলেও স্থির প্রভার আলোক লইয়া যে ব্যক্তি উদ্যানে প্রবেশ করিল—তাহার আর কিছুই দেখিতে বাকী রহিল না; সে যাহা দেখিল—তাহাতে তাহার বিস্ময়ের অবধি ছিল না সত্য—তবু সে নির্ব্বাক বিস্ময়ে সেখান হইতে চলিয়াই যাইতেছিল। কিন্তু তাহাকে ফিরিতে দেখিয়াই তিনকড়ি বাগানের বেড়া অতিক্রম করিয়া পলায়ন করিল—আর সুষমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল "ধর—ধর" যে লোকটা আসিয়াছিল—সে সুষমার কুলপুরোহিত হইলেও জমীদার-তনয়ার এই আদেশ অমান্য করিতে পারিল না—আদেশ বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনকড়ির পশ্চাদ্ধাবন করিল—কিন্তু তখন তিনকড়ি অন্ধকারে মিশিয়া গেছে।

পুরোহিত ফিরিয়া আসিয়া যখন সুষমাকে এই সংবাদ দিলেন তখন অগত্যাই সে গৃহে ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু এই তিনকড়ির আবির্ভাব উপলক্ষ্য করিয়া তাহার মন এমনই আঘাত পাইয়াছিল যে, কালীর স্বামীর উদ্দেশ্যে লিখিত খামখানা কখন যে তাহার হা

হইতে পড়িয়া গেছে, তাহা সে কিছুই জানিতে পারে নাই। এমনই হতবুদ্ধি হইয়া সে উদ্যানবাটী ত্যাগ করিয়া গেছে।

কিন্তু সেই খামখানাই প্রত্যাবর্ত্তন কালে পুরোহিতের চক্ষে পড়িয়া গেল। আর এই জিনিষটা কি তাহা দেখিবার জন্য উঠাইয়া লইতেই সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন যে, তাহাতে মেয়েলী অক্ষরে বেশ স্পষ্ট করিয়াই লেখা রহিয়াছে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বটব্যাল।

কালীর স্বামীর নাম যে তিনকড়ি, তাহা পুরোহিত বুঝিলেন না। সুষমার কার্য্য ও চরিত্র সম্বন্ধে মনটাকে একেবারে কালী করিয়া লইয়া ফিরিয়া গেলেন।

---

(২৩)

কিন্তু সে যাহা হউক—এই রূপেই আহত ও অপমানিত মন লইয়া সুষমা যখন নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন বাহিরের অবিরল জলধারার মত তাহার চক্ষেও জলধারা নামিতেছিল। নিজেকে শুক্তির মত কঠিন আবরণে আবৃত রাখিলেও তাহার নিভৃত অন্তরে নারীত্বের দৌর্ব্বল্য একেবারে মরিয়া যায় নাই বলিয়াই বিপদে ও বিগ্রহে নারীর যাহা একমাত্র সম্বল,

সেই অশ্রুই তাহার চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। আর এতদিন পরে স্বামীহীনা রমণীর নিঃসহায় অবস্থা তাহার মানস চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। এমন কি রিক্ত বিতাড়িত দরিদ্র বীরেশ্বরকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করিতে ও তাহার মন সঙ্কুচিত হইল না। সে দর-বিগলিত অশ্রু লইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, কোথায় আজ তুমি দেবতা, তোমার পতিতা অপমানিতা ধর্ম্মপত্নীকে ফেলিয়া কোথায় র'হয়াছ? আমি অপরাধ কারয়াছিলাম বালয়া তুাম আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে কেন? কেন আমায় শাসন করিলে না, শাসনে তোমার পদানত করিলে না?

হায় রে, নারী যেদিন আঘাত পায় সে দিন সে এমনই করিয়াই অশ্রু ত্যাগ করে বটে, এমনই করিয়াই কাঁদিয়া কাটিয়া পরকেও কাঁদাইয়া থাকে সত্য, কিন্তু সে যেদিন নিজের নারীত্বকে অতিক্রম করিয়া পুরুষের বিরুদ্ধেই খড়গ তুলিয়া বসে, সেদিন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে সে কথা একবার স্মরণ মাত্র করে না।

কিন্তু সে যাহাই হউক এই দীর্ঘ ও দুঃসহ জীবন লইয়া সুষমা যে আর এখানে থাকিতে পারিবে না, অন্য কিছু স্থির হউক না হউক এইকথা একেবারে স্থির হইয়া গিয়াছিল। সংসারে আর্থিক অবস্থা তাহার যতই সুসম্পন্ন হউক, সাংসারিক জীবনে সে যে একেবারে নিঃসহায়, একথা জানিতেও আর কাহারও বাকী ছিল না।

তাহার পিতা নাই, মাতা নাই, স্বামী থাকিয়াও নাই, সংসারে নারীর সব চেয়ে বড় আত্মীয় যাহারা তাহাদের মধ্যে কেহই নাই; শুধু রূপ আছে, যৌবন আছে, আর অর্থবান পিতার পরিত্যক্ত অর্থ আছে। অসহায় নারীর জীবনে দুর্গতির মূল যেগুলা, সবই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু নারীত্বের সম্মান পর্য্যন্ত ক্ষুন্ন হইতে বসিয়াছে। আজ যদি সুষমার মা থাকিত? তাহা হইলে এই সুনিবিড় লজ্জা ও বেদনার আঘাতে তাহাকে বাণবিদ্ধা হরিণীর মত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার জন্য তাহার নিভৃত বন্য আশ্রমে আসিয়া শোনিতস্রাব করিতে হইত না; জননীর অঞ্চলে এই অশ্রুরাশিকে একেবারে লুকাইয়া ফেলিতে পারা যাইত।

তাহা হইলে এই যে কলঙ্ক আজ একান্ত মিথ্যা হইয়াও সত্যরূপে সুষমার কুলপুরোহিতের চোখে পড়িয়া গেল, তাহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিবার যে অগ্নিপরীক্ষা এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহা বোধ করি সমারোহ না করিয়াও সুসম্পন্ন হইত। কিন্তু এখন পুরোহিত তাহাকে যতই স্নেহ করুন এবং তাহার পিতার অন্নে প্রতিপালিত বলিয়া যতই সম্মান করুন, সুষমার চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার যে সন্দেহ নিশ্চয় জন্মিয়া গেছে, তাহা দূর করা যেমন প্রয়োজন, তেমনই কষ্টসাধ্য হইবে তাহা বুঝিতে সুষমার বাকী রহিল না। তাই বাহিরে যে বৃষ্টি তখনও পড়িতেছিল, তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই সুষমা একজন

পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে গেল আর আরব্ধ আরতি সমাপ্ত হইলে পুরোহিতকে নির্জ্জনে ডাকিয়া সেদিনকার সন্ধ্যার ইতিহাস খুলিয়া বলিয়া বলিল "কাকা আমি এইবার তীর্থে বাস ক'র্ব্ব মনে করেছি।"

পুরোহিত এ কথায় একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বলিলেন "সে কি কথা মা এই বয়সে তুমি তীর্থে যাবে কি?"

সুষমা মাথা হেঁট করিয়া বলিতে লাগিল "পুরুত কাকা—বাবা মারা যাওয়ার পর আমি যে কাজ এতদিন ক'রে এসেছি তা'তে অত্যন্ত অহঙ্কারের পারচয় দিয়েছি। আমি বড় লোকের মেয়ে ছিলাম, বাবার কাছে আর তোমাদের কাছে স্নেহ ছাড়া কোনদিন শাসন পাই নাই, তাই নিজেকে অত্যন্ত বড় ভেবেছিলাম, ভেবে কত অন্যায়ই করেছি। কিন্তু আজ ঠেকেছি, দোষ করেছি ব'লে তোমরাও ত আমাকে উপদেশ না দিয়ে দূরেই রেখে দিয়েছিলে। কিন্তু সে যা হ'ক আজ আর আমি ভুল কর্ব্ব না; যার কাছে খুব দোষ করেছি তা'কে একবার ফেরাতে চেষ্টা ক'র্ব্ব। না পারি আমিও আর ফিরবনা। কাকা, তিনকড়ি আমাকে অপমান ক'র্ত্তে সাহস করে? আর তোমরা তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে? বলিয়া সুষমা কাঁদিয়া ফেলিল।

সুষমাকে কাঁদিতে দেখিয়া পুরোহিত একেবারে ত্রস্ত হইয়া

উঠিয়া বলিলেন—না না, মা, কাল তিনকড়ে বেটাকে ধ'রে নিয়ে এসে চাব্‌কে ছাড়্‌ব'! ও ছোট লোক বেটা ত এখানে ছিল না কাল নাকি এসেছে, আচ্ছা কাল ওকে দেখে নেব।

সুষমা তখন চোখের জল মুছিয়াছিল। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, না কাকা কাল ওকে দেখে আর দরকার নেই, তা'তে আমার লজ্জাই বাড়বে।

তাইত' মা সে কথাও ত' বটে। আর এই জন্যই ত' এই সব ছোট লোক বেটারা এত বেড়ে ওঠে। আচ্ছা, সুযোগ আমি কখনও না কখনও নিশ্চয়ই পাব। তখন আমি কিছুতেই ওকে ছাড়বো না তা তুমি দেখে নিও।

কিন্তু পুরোহিত তাহাকে লইয়া যাহাই করুন এবং সুষমাকে যাহাই দেখিয়া লইতে হউক, সে বিষয়ে এখন আলোচনা প্রয়োজন নাই দেখিয়াই সুষমা বলিল, আমি বল্‌ছি কি কাকা আমি যদি ফিরে না আসি আমার এই সম্পত্তি তুমি পুরোহিত তুমি দেবসেবার জন্য রাখ্‌বে আর বাকী ব্যবস্থা আমি সব ক'র্ব্ব।

কিন্তু তুমি আমাদের ছেড়ে কেন যাবে মা! আমরাই গিয়ে জামাই বেটাকে খুঁজে নিয়ে আস্‌ছি—বলিয়াই হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল যে এতদিনপরে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়াও শক্ত; তাই কথাটা একটু ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন যে, তোমাদের এই ঝগড়ায়

মধ্যে আমরা কি থাকৃতে পারি মা? কিন্তু সে যাই হোক্ এখন সে বেটা কোথা আছে ব'লে দাওত' তা'কে দুদিনের মধ্যে ধ'রে নিয়ে আস্‌ছি।

নিবিড় জলদ জালের মধ্যে একটুখানি বিদ্যুৎরেখার আত্ম প্রকাশের মত সুষমার অধরে একটুখানি সলজ্জ হাসি দেখা দিল, সে বলিল তা'কে আনা শক্ত কাকা কোথায় আছে তা'ও আমি ঠিক জানিনা, যে ঘর ছেড়েছে সে কি এক জায়গায় ব'সে আছে। কিন্তু সে যা'হোক্ আমারও ত' ঘর ছাড়বার সময় হ'য়েছে কাকা। তুমি কাল একবার খুড়ীমাকে পাঠিয়ে দিও, যাবার আগে একবার তাঁর পায়ের ধুলো নেব। আর সেবারকার পূজোর সময়কার গরদের শাড়ীটা তাঁর পাওনা আছে, সেটাও দিয়ে দেব। এই বলিয়াই সুষমা পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

পুরোহিত একেবারে শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হ'য়েছে মা হ'য়েছে মা, আর প্রণাম কর্ত্তে হবে না, আমি আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি তুমি জামাই বেটাকে ধ'রে নিয়ে ঘরে এস।

সুষমা যাইতে উদ্যত হইয়া সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া বলিল আচ্ছা কাকা, এ আমার কি দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল ব'ল্‌তে পারো, কবে কোন্ ছেলেবেলায় আমি কাশী গিয়েছিলাম, সেখানে একদিন গঙ্গাস্নান ক'র্ত্তে যাবার পথে একজন গনৎকার আমার হাত দেখে

ব'লেছিল যে, আমি স্বামীঘাতিনী হব। তখন আমার বয়স ত' মাত্র দশ। কিন্তু সেই দশবৎসর বয়সের কথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারি নাই, আমি চিরদিনই স্বামীকে দূরে দূরে রেখেছি, পাছে আমি কোনরূপে তা'র অমঙ্গল করে বসি! আর যেদিন তিনি চ'লে গেলেন সেদিন সেই জন্যই আমি বিশেষ বিচলিত হই নাই; আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমি কাছে না থাকলে তার অমঙ্গল হবে না। কিন্তু আজ এই দেবমন্দিরে দাঁড়িয়েও আমার বুকের ভিতরটা কাঁপছে—কি জানি কি হবে।

পুরোহিত লোকটি ছিলেন একটু অতিমাত্রায় সরল—তিনি তিনকড়ির নামে লেখা খামখানা দেখিয়া যে পরিমাণ বিরক্ত হইয়াছিলেন—সুষমার এই সমস্ত কথা শুনিয়া সে সব ভুলিয়া একেবারে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন—বলিলেন 'বটে মা—বটে, এর ভিতরে এতকথা আছে—তাই ত' বলি আমাদের রমেশদা'র মেয়েটা এমন হ'ল কেন? হ'লোই বা তিনি জমিদার—তিনি যে কি প্রকৃতির লোক ছিলেন—তাত' আর আমাদের অজানা নাই কিনা? এর ভিতরে এতকথা যে আছে, তা' বেটী এতদিন কি কাউকেও ব'লতে নাই? একটা স্বস্ত্যয়ন ক'রে দিলেই যে হাঙ্গামা—হায়! হায়! হায়!—এই পর্য্যন্ত বলিয়া বোধ হয় রাত্রি গভীর হইয়াছে দেখিয়াই তাঁহার প্রাপ্য শীতলের নৈবেদ্যগুলা গামছায়

বাঁধিতে লাগিলেন এবং বাঁধা প্রায় শেষ হইলে বলিলেন—আচ্ছা আমি কালই তোমার খুড়ীমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—সে তোমায় বুঝিয়ে সুঝিয়ে যাবে এখন। দেখ দিকিন মা, এ সমস্ত কি ছেলেমানুষী ক'রে ব'সে আছ।

সুষমার হয় ত আরও কিছু বলিবার ছিল—কিন্তু শ্রোতাকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া সে পথ ছাড়িয়া দিল।

আচ্ছা মা, তুমি বাড়ী যাও রাত হ'য়েছে। বৃষ্টিটা ধ'রেছে এই বেলা আমিও চ'লে যাই—কালই তোমার খুড়ীমাকে আমি পাঠিয়ে দেব, বলিতে বলিতে তিনি প্রস্থান করিলেন। কিন্তু আজকার রাত্রের ঘটনাটা কারও কাছে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিবার কথাটা সুষমার ওষ্ঠাগ্রে আসিয়াও থামিয়া গেল—পুরোহিত অন্তর্হিত হইলেন।

---

(২৪)

কিন্তু তারপরও সুষমা বহুক্ষণ সেই দেবমন্দিরে সুপ্ত দেবতার রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে বসিয়া রহিল; বোধ করি সেদিনকার সন্ধ্যার ঘটনাটা তাহার অন্তরে তখনও মৃদু কম্পন জাগাইয়া রাখিয়াছিল,

বুঝি তাহার অপমানিত নারীত্ব আজ অপমানিত—অপমানের কশাঘাতে দূরে-প্রোষিত স্বামীর পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছিল—তাই দেবমন্দিরের পবিত্র আবেষ্টনের সংস্পর্শ সে ত্যাগ করিতে পারিতেছিল না।

এ কথা সত্য বটে, সুষমার যখন দশ এগার বৎসর বয়স, সেই সময় সে তাহার পিতার সঙ্গে কাশীতেই ছিল। একদিন প্রাতঃকালে তাহাদের বৃদ্ধা এক পরিচারিকার সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করিতে যাইবার পথে এক জ্যোতিষী তাহার হাত ধরিয়া বলিয়াছিল যে, এই মেয়েটীর সবই সুন্দর, শুধু তাহার স্বামীহন্ত্রী হইবার লক্ষণ রহিয়াছে—এই একটা বড়ই অমঙ্গলের চিহ্ন—নহিলে এই মেয়েটীর লক্ষণগুলি সবই ভাল।

কিন্তু সমস্ত সুলক্ষণের মধ্যেও যে লক্ষণটীর কথা জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন তাহাতেই শুধু পরিচারিকা নহে স্বয়ং সুষমা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত কি করিলে এই অলক্ষণের পরিসমাপ্তি হইবে জানিতে চাহিলে জ্যোতিষী নাকি বলিয়াছিলেন যে বিবাহ দিতে বিলম্ব করিলেই ভাল হয় এবং তাহা যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে অন্ততঃ কিছুকাল স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না রাখিলে হয়ত' শুদ্ধ মাত্র একটু শোণিতপাতেই এই দুষ্ট লক্ষণের অবসান হইতে পারে।

কিন্তু স্বামীর শোণিতপাতও যেমন বাঞ্ছনীয় নহে, বিবাহিত

জীবনে ঘনিষ্ঠতা না রাখাও তদধিক অনভিপ্রেত, ইহাও যে কেহই বুঝিতে পারে। কিন্তু ইহা সত্য হইবে কি মিথ্যা হইবে এবং সত্য হইলেও তাহা কতদিনে সম্ভব তাহার কিছুই ঠিক ছিলনা বলিয়া সে কথা আর কাহারও কাছে প্রকাশ করা হয় নাই, করিয়াও কোন লাভ ছিল না কিন্তু এতদিন সুষমা তাহার বিবাহিত জীবনে যে অবস্থার মধ্য দিয়া পথ চলিয়াছে—এবং জীবনের মধ্য পথে যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাকে বিবাহিত জীবন না বলিলেও চলে; এবং সীমন্তের সিন্দুরকে আয়ত উজ্জ্বল রাখিয়া এই স্বামী-বিরহিত জীবন শুদ্ধ মাত্র লাঞ্ছনা নয়, লোকলজ্জার অতি বড় কেন্দ্রস্থল—এ সত্যও আজ আর তাহার কাছে অপরিচিত নহে।

তাই ভবিষ্যতের ভাবনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া সুষমা আজ স্বামীর সন্ধানে চলিতে প্রস্তুত হইয়াছে। স্বামীকে ফিরিয়া পাওয়ার মধ্যে দ্বিধা আছে সত্য, এবং সুষমার সঙ্গদোষে তাঁহার অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা আছে জ্যোতিষীর এইরূপই গণনা ছিল। কিন্তু তথাপি সে সমস্ত অকল্যাণকেই বরণ করিয়া পথে বাহির হইবে—স্বামীকে ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব না হইলেও অনন্তকাল তাঁহার অন্বেষণ করিবে, আর তাঁহার অকল্যাণ হইলে নিজে সে অকল্যাণের অংশ লইতেও দ্বিধা করিবে না। এখানে এই পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রীর মত বসিয়া ভেকের পদাঘাত সহিবে না—সে বিষয়ে হৃদয় তাহার একেবারে প্রস্তুত হইয়া গেছে।

তাই পরদিন প্রাতে উঠিয়াই সুষমা নায়েবকে ডাকিয়া কতকগুলি অত্যাবশ্যক ব্যবস্থার কথা বলিয়া দিল—আর সে চলিয়া যাওয়ার পর যদি কখনও বসন্ত ফিরিয়া আসে—তাহা হইলে এই জমীদারীর আয় হইতে তাহাকে প্রতি মাসে একশত টাকা বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা কাগজে কলমে সই করিয়া দিয়া নায়েবকে সাক্ষী স্থানে সই করিতে বলিল। নায়েব কতকটা বিস্মিত হইয়াছিল বটে,কিন্তু প্রভু কন্যার ইচ্ছাতে বাধা দিল না। সই করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কিছু হুকুম আছে মা ?

সুষমা লজ্জিত হইয়া বলিল "আমাকে হুকুম কর্ব্বার কথা ব'লবেন না জেঠামশাই, আপনি আমার বাবার বড় ভাইয়ের মত। বসন্ত আমার বড় উপকার ক'রেছে তা'কে আমার কিছু দেওয়া উচিত তাই আপনার উপর এই ভার দিয়ে যাচ্ছি। ;এই জমিদারীর ভার ত' আপনাদের উপর রইল। আমিত' আজ আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি, আর যে কাজে যাচ্ছি তা'তে আপনারা আমায় বাধা দেবেন না। কিন্তু আমার একটা শেষ ইচ্ছা আছে, সেটা কি আপনারা আমার কথায় পূরণ কর্ব্বেন ?" বলিয়া কতকটা অসহায় ভাবে নায়েবের মুখের দিকে তাকাইল।

নায়েব এই পতি-অন্বেষণে গমনোন্মুখী মেয়েটীর প্রতি কতকটা শ্রদ্ধাপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া স্নেহপূর্ণস্বরেই জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কি ইচ্ছা বল মা ?"

সুষমা অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আজ বৈকালে সমস্ত গ্রামবাসীদের সম্মুখে তিনকড়িকে ধরে এনে পঁচিশ ঘা বেত মার্ত্তে হবে, আমার একথা থাক্‌বে কি ?

নায়েবের বিস্ময়ের বোধ হয় অন্ত ছিল না। কিন্তু এই জমীদার-তনয়ার জমীদারের মত তেজ দেখিয়া শ্রদ্ধায় গর্ব্বে সে পুলকিত হইয়া উঠিল, আর প্রায় হাস্যমুখেই জবাব দিল, তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাক্‌বে না মা ; তুমি যে আজ সত্যই একটা বড় কাজ কর্ত্তে চেয়েছ, তা'র সন্ধান সত্যই পেলাম ; পেয়ে বোধ হয় ধন্য হ'লাম। এই হুকুম না দিয়ে যদি তুমি চ'লে যেতে, তাহ'লে তোমার স্বামীর উদ্দেশ্যে যাওয়া একান্তই মিথ্যা যাওয়া হ'ত। তোমার এই অনুরোধটাই সব চেয়ে বড় হুকুম। তুমি যে শুধু মেয়ে মানুষই নও, জমীদারের মেয়ে তা' আমি আজই লোককে জানিয়ে দিচ্ছি—বলিয়াই নায়েব চলিয়া গেল।

অপরাহ্নে গ্রামবাসী অর্দ্ধেক নরনারীর সম্মুখে তিনকড়ির শাস্তি হইয়া গেল—আর তাহার ভাল মন্দ সমালোচনা শুধু নারী মহলে নয়, পুরুষ মহলে এমনই উত্তেজনার সৃষ্টি করিল, যেন এক ক্ষুদ্র শান্তিময় গ্রামে সহসা বিনা বিচারেই একজনের ফাঁসি হইয়া গেছে। তাই পাঠশালার পণ্ডিত হইতে লোহাপেটা কর্ম্মকার পর্য্যন্ত রাত্রের কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া পথপ্রান্তে দল বাঁধিয়া বসিয়া এই একই কথার

সদর্থ ও কদর্থ করিয়াছে এবং যতক্ষণ না প্রত্যেকেই ঘুমে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে, ততক্ষণ কেহই সে স্থান ত্যাগ করে নাই। আর অন্তঃপুরের স্থানে স্থানে এই একই কথায় অন্ততঃ পঁচিশজন গৃহকর্ত্রীর প্রত্যেকেই চাপাস্বরে ভয় ও বিস্ময় প্রকাশ করিতে করিতে এমনই তুমুল কোলাহল তুলিয়া ছিলেন যে, তাহাতে শুধু তাঁহাদের প্রত্যেকের রন্ধনশালায় অত্যন্ত দুর্গতি হয় নাই, আশে পাশে গ্রামের লোকেরা অগ্নিকাণ্ডের কল্পনা করিয়া ত্রস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল।

কিন্তু এইখানেই ইহার অবসান হয় নাই, প্রত্যেক গৃহকর্ত্তাই খাইতে বসিয়া গৃহিণীকে ভৎর্সনা করিয়াছেন, আর রাত্রে শিশুরা কাঁদিলে প্রত্যেক জননীই তিনকড়ির শাস্তির কথা বলিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়াছেন। সমস্ত গ্রামে সে রাত্রে এমনই এক বিভীষিকা গ্রামবাসীকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু পরদিন প্রসন্ন নবীন মুর্ত্তিতে প্রভাতের উদয় হইল; প্রভাত অরুণের তরুণ আলোকে ধরিত্রীর সর্ব্ব অঙ্গ তেমনই স্বর্ণোজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সিন্দূর-ভূষণা উষা প্রসন্নহাস্যে তাহার অরুণ-কিরণের স্বচ্ছ সাড়ীখানি সর্ব্বগাত্রে তেমনই করিয়া জড়াইলেন। আর সেই সময়েই গৈরিক-বসনধারিনী সুষমা তাহার আজন্মের পরিচিত গ্রাম আশৈশবের লীলাভূমি পিতৃগৃহ ও পিতার জমীদারী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

পশ্চাতে রোরুদ্যমান দাসদাসী চলিয়াছিল বটে, কিন্তু পাছে তাহাদের সান্ত্বনা দিতে গিয়া নিজেই সর্ব্বসমক্ষে কাঁদিয়া ফেলে, তাই সাহস করিয়া সুষমা তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিতেও ছিল না।

কিন্তু গ্রামপ্রান্তে আসিয়া গ্রাম হইতে ও গ্রামের অধিবাসী-বৃন্দের কাছ হইতে যখন জন্মের মত বিদায় লইতে হইল, তখনই বিচ্ছেদের যাতনা তাহার চক্ষে অশ্রুর ধারা ছুটাইয়া দিল। সে সজল-নেত্রে একবার পশ্চাতে চাহিয়া সকলের কাছ হইতে বিদায় চাহিল এবং সে স্বামী অন্বেষণে যাইতেছে স্বামীকে পাইলেই সে আবার ফিরিয়া আসিবে; গ্রামের সঙ্গী ও আত্মীয়েরা তাহাকে যেন ভুলিয়া না যায়—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই গাড়োয়ানকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিল। পশ্চাতে দুইজন মাত্র পাইক যে তাহার সঙ্গে চলিল তাহা বোধ করি সে লক্ষ্যও করিল না।

আর সীতার নির্ব্বাসনে প্রজাদের যে পরিমাণ দুঃখ হইয়াছিল—সুষমার পশ্চাতে দলবদ্ধ ভাবে যাহারা দাঁড়াইয়া রহিল—তাহারা এতাদন যাহাই বলিয়া থাক্—সেদিন তাহাদের দুঃখ যে তা'র চেয়ে কম হইয়াছিল, তাহাদের সজল চোখ দেখিয়া তাহা কিছুতেই বোধ করা গেল না। কারণ মানুষ তাহাকে একদিন হয়ত' অকথ্য দুর্নাম দিয়াছিল কিন্তু আজ তাহার এই বিদায়কে উপলক্ষ্য করিয়া বেহুলার বিসর্জ্জন হইয়া গেল, এ কথাও তাহাদের মুখ দিয়া বাহির হইয়া ছিল।

(২৫)

সুষমার জীবন যেখানে আরম্ভ হইয়াছিল, যেখানে তাহার জীবনের প্রায় সমস্ত কর্ম্মসূত্রই আরম্ভ হইয়াছিল এবং শেষও হইয়াছিল সে সকলের আজ প্রায় একসঙ্গেই অবসান হইল।

স্বামীর সম্বন্ধে অনিশ্চিত ধারণা লইয়াই সে পথে বাহির হইয়াছিল, সুতরাং সেদিক হইতে কোন বেদনাই তাহাকে পীড়িত করিতে পারে নাই। কেবল বসন্তর এই অন্তর্দ্ধান গমনকালে তাহার সংযত চিত্তকেও পুনঃপুনঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছিল। আর সে যে সুষমার বিদায় ক্ষণে একটিমাত্র অশ্রুবিন্দু ফেলিল না, জানিতে পারিল না যে, সুষমা আজ সত্যই স্বামীর সন্ধানে চলিল এবং জন্মের মত চলিল, এই আক্ষেপই তাহাকে বারংবার পীড়িত করিতে ছাড়িল না।

কিন্তু বসন্ত যে ঠিক সেই সময়েই তাহাদের মিলনের অগ্রদূত হইয়া বহুপূর্ব্বেই কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, আর সুষমাকে ঠিক সেই পথেই টানিয়া আনিবার জন্যই তিনকড়ির কাছে অভিনয় করিতেও ত্রুটী করে নাই, তাহা যদি সুষমার জানা থাকিত তাহা হইলে আজ হয়ত' তাহার ভৃত্যের প্রভুভক্তি দেখিয়া প্রভুর ঈর্ষার অন্ত থাকিত না।

কিন্তু বসন্ত যাহা মনে করিয়া গিয়াছিল কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ঠিক তাহার বিপরীত দেখিতে পাইল। তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির যে পথটা সে কতকটা সুগম ভাবিয়া লইয়া যাত্রা করিয়াছিল গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া দেখিল যে, তাহা একেবারে দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম যেদিন সে প্রভুকে দেখিতে আসিয়াছিল, সেদিন প্রভুও তাহার প্রণয়িণীর মধ্যে প্রেমের জোয়ার পূর্ণ বেগেই ছুটিতে দেখিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহাতে একেবারে ভাটা পড়িয়া গেছে। কারণ এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর সম্মিলনে সেদিন এক শিশুর আবির্ভাব হইয়াছে, আর তাহারই জন্য এই ক্ষুদ্র সংসারে ক্ষুদ্রও বৃহৎ অশান্তির অন্ত রহে নাই।

সুবিধা পাইলে অন্যায় করিতে নর ও নারী কেহই ছাড়ে না বটে, কারণ অন্যায়ের আপাত মধুর আকর্ষণের মোহিনী শক্তি ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে, অতি মানুষ ছাড়া অন্য কাহারও স্নায়ু ও শোনিতে বোধ করি সে শক্তি আজ আর অবশিষ্ট নাই। তাই অন্যায়ের প্রথম আকর্ষণ যেখানেই মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়াছে, সেখানেই কি নর কি নারী পরস্পর একবারে ঘনিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অন্যায় যেখানেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দারিত্ব আনয়ন করিয়াছে, সেখানেই মতবিরোধ হইয়াছে এবং পূর্ব্বেকার প্রতিষ্ঠিত শান্তি ও মিলন একেবারে ছন্নছাড়া হইয়া গেছে।

তাই সেদিন যেখানে নিত্যনিয়ত তুফান ছুটিয়া যাইত, আজ সেখানেই প্রতি কথায় ভাটা আসিয়া পড়িতেছে, আর অশ্রু ও ক্রোধের অবধি নাই।

কারণ এ সংসারে প্রেম যতখানিই থাক্‌ দারিদ্র্যের ত' অন্ত ছিলনা। আর দারিদ্র্য যেখানেই প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে স্নেহ ও প্রেম সেইখানেই মস্তক অবনত করিয়াছে। প্রেম সুন্দর ও মহৎ এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই, কিন্তু অনাহারে প্রেম বহুদিন স্থায়ী হইয়াছে তাহার এতবড় গুণের কথা আজ পর্য্যন্ত শোনা যায় নাই।

কিন্তু শুধু এই শিশুর আবির্ভাবই এ সংসারের কর্ত্তা ও গৃহিনীর ভাবান্তর আনয়ন করে নাই। সুষমা ও বসন্ত যেদিন আসিয়া বীরেশ্বরের উপর আত্মীয়তার দাবী করিল, সেইদিন হইতেই এই দুই নরনারীর প্রেমের বাঁধন শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কারণ যাহারা উভয়ে উভয়কে নিরাশ্রয় ও নিরবলম্বন জ্ঞানে আশ্রয় করিয়াছিল তাহাদেরই একজনের যখন দ্বিতীয় আশ্রয় মিলিল, তখন অন্যপক্ষ যে আত্মীয়তার অনুসন্ধান করিবে এ ঘটনা একেবারেই বিচিত্র নয়। তাই মুনিয়া যখন দেখিল যে, সে যাহাকে অবলম্বন করিয়াছে সে একেবারে নিরবলম্বন নহে—তখনই তাহার ভবিষ্যৎ ভাবনা আসিয়া জুটিল। এতদিন তাহারা এ সংসারের সকল স্নেহ ও শত্রুতা হইতে মুক্ত হইয়া মুক্ত গগনতলে পৃথিবীর সমস্ত জটিলতা ও কুটিলতার সম্পূর্ণ

একান্তে তাহাদের নিভৃত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিল। সেখানে তাহাদের স্নেহ করিতে ও শাসন করিতে শুধু তাহাদের দু'জন ছাড়া আর কেহই অবশিষ্ট ছিলনা। প্রভাত সূর্য্যের কিরণরশ্মি হইতে নৈশ জ্যোৎস্নার সোণালী আলো এবং কুজ্ঝটিকা হইতে প্রবল ঝটিকা তাহাদের কুটীরের উপর সমানভাবেই শাসনদণ্ড চালাইয়া গেছে। তাহাদের এই একান্ত একাকী জীবন তাহাদের দুটীমাত্র প্রাণীকে লইয়া এতদিন এক নিরবছিন্ন সুখসুপ্তি ও সরল বিশ্বাসে কাটিয়া গেছে।

কিন্তু সুষমাও বসন্ত'র আবির্ভাবের পর হইতে সেখানে দ্বিধা আসিয়া জুটিয়াছিল; সেদিন হইতে হাসিতে গেলেই কান্না আসিত, আর কান্নার গলা টিপিয়া ধরিলে আর কিছুই আসিত না। যেন দূরে— অতি দূরে এক ক্ষীণ অমঙ্গলরেখা ক্ষীন ধূমশিখার মত আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে বলিয়া মনে হইত, আর অন্তর অন্তরালে দাঁড়াইয়া আত্মহত্যা করিতে চাহিত।

কিন্তু এই সময়েই এক শিশু আসিয়া তাহার মাতা ও পিতার মধ্যে যে নব বন্ধনের সূচনা করিল, তাহাই হয়ত' আর একদিন পূর্ব্বেকার সরল বিশ্বাসে পরিণত হইত; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কঠোর দারিদ্র্য আসিয়া কণ্ঠ নিপীড়ন করিল, আর হ্রী ও শ্রী যে যেখানে ছিল, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না।

আর চক্ষে না দেখিলে হয়ত' বিশ্বাস করা যায় না যে, বসন্ত যেদিন নন্নুকে লইয়া তাহার প্রভুর কুটীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল—সেদিন সে অতিমাত্র বিস্ময়ে দেখিল যে তাহার সেই প্রভুই এক গাছা অর্দ্ধ ভগ্ন ছড়ি লইয়া স্বহস্তেই মুনিয়াকে প্রহার করিতেছেন।

হায়রে, সঙ্গ ও অবস্থা মানুষকে হীন করিয়া দেয় সত্য, কিন্তু তাহার অধঃপতন যে সর্ব্ববিধ বৈধ দীনতার ও এত নীচে তাহা বোধ করি স্বয়ং ভগবান আসিয়া বলিলেও বসন্ত বিশ্বাস করিত না—কিন্তু স্বচক্ষে তাহার পূজাপাদ প্রভুর যে আচরণ সে আজ প্রত্যক্ষ করিল—তাহাতে তাহার দুঃখ ও লজ্জার অবধি রহিল না বটে, কিন্তু অতঃপর এ সংসারে কিছু অসম্ভাব্য আছে বলিয়া সে বিশ্বাস করিল না। এক হস্তে চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া সে আর্ত্তস্বরে রোদন করিয়া উঠিল—যেন সহসা পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে—যেন প্রভাতের স্বর্ণ-সূর্য্য এক প্রচণ্ড গ্রহের প্রকাণ্ড সংঘাতে একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া তাহারই পদতলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি-বাহী স্বর্ণতরীখানি যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত বেদনাকে আহত ও ব্যাহত করিয়া ঠিক মুক্তির কুল স্পর্শ করিয়াই কলঙ্ক কালিমায় ভরিয়া গেছে।

বসন্ত'র চেতনা লুপ্ত হইত কিনা বলা যায় না, হইলেও ক্ষতি হইত

কি না বলা যায় না। কারণ সংসার তখন ঠিক ভাবে চলিতেছিল কিনা—তখন প্রভাতের গায়ে আলো ছিল কিনা—নিঃশ্বাসে সমীর ছিল কিনা—সমীরে জীবন ছিল কিনা—কোনটাই তাহার বহিরিন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিতেই পারিল না—তখন বিধি ও ব্যাধি মানবের প্রাকৃত জীবনে কোন্‌টা সত্য এবং কোন্‌টা মিথ্যা তাহার কোন তথ্যই তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেছিল না—এবং হয়ত' তাহার অবশ দেহ ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইত না। কিন্তু ঠিক এমনই সময়ে নন্নু একেবারে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত ছুটিয়া আসিয়া বীরেশ্বরের উপর লাফাইয়া পড়িল—আর তাহারই হস্ত হইতে অর্দ্ধভগ্ন ছড়িটা লইয়া তাহারই মস্তকে এমনই দারুন আঘাত করিল যে, সেই একটা আঘাতেই বীরেশ্বর একেবারে ভূলুণ্ঠিত হইল, আর তাহার মাথা ফাটিয়া প্রবল বেগে শোণিত ধারা ছুটিল।

(২৬)

তখন পূর্ব্বাকাশে প্রভাত হইয়াছে মাত্র—সূর্য্যের রথচক্র মেদিনীও তদ্দেশ নিবাসী মানবের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল না বটে, কিন্তু

অরুণের কিরণদূত ধরিত্রীর অঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিতে ত্রুটী করে নাই—আর তাহারই রথের সপ্তবর্ণ অশ্বের মিশ্রিত বর্ণ সপ্তকে পৃথিবী শুধু ভরিয়া যায় নাই, সে রথের অশ্বগণের উষ্ণ নিঃশ্বাস ধরিত্রীর পৃষ্ঠে উষ্ণতার সঞ্চার করিতেছিল। উপরে আকাশ সিন্দুর বর্ণে একেবারে রঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে—আর নিম্নে বসন্তর প্রভু রক্তাপ্লুত দেহে ধরিত্রীকে সুরঞ্জিত করিয়া দিয়াছে—আর উপর ও নীচেকার এই দুই বিভিন্ন শোণিত ধারার দর্শকরূপে শুধু বসন্ত ও মুনিয়া নহে স্বয়ং নন্দু এবং সদ্যোজাত শিশুটা পর্য্যন্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেছে।

এই বিস্ময় ও এই অনুভূতি যদি শাশ্বত হইত—আকাশের ঐ গাঢ় রক্তিমা, জবা-কুসুম-সঙ্কাশ রবির প্রথম অভ্যুদয়—আর ধরিত্রীর এই শোণিত সজ্জা, বীরেশ্বরের রক্তাপ্লুত দেহের শোণিত ক্ষরণ যদি চিরস্থায়ী হইত—বসন্ত মুনিয়া নন্দু ও শিশুটার দেহ যদি পাষাণে পরিণত হইত—তাহা হইলে হয়ত' সে ছবি জগতের চিত্রশালার এক অভিনব সম্পদ হইয়া উঠিত। কিন্তু যেহেতু যেখানে জীবন আছে—সেখানেই স্পন্দন আছে—আর শ্বাস থাকিতে আশারও অবধি নাই, তাই যাহা স্থায়ী হইলে সুন্দর হইত—তাহা স্থায়ী হইল না। অল্পক্ষণ পরেই হৃতচেতন বীরেশ্বর উঠিয়া বসিল—আর তাহাকে বসিতে দেখিয়াই বসন্ত ত্রস্ত হরিণ শিশুর মত ছুটিয়া আসিয়া তাহার

পায়ের কাছে পড়িল—আর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল—বাবা, তুমি বাড়ী ফিরে চল—কেন এই ছোট লোকের সঙ্গে—

তাহার কথা সমাপ্ত হইল না—বীরেশ্বর অতি কষ্টে চক্ষু দুটা বিস্ফারিত করিয়া একবার তাহার দিকে চাহিল—চাহিয়াই চক্ষের উপরকার শোণিত ধারাটা বাম হস্তে মুছিয়া ফেলিল—তারপর একটু স্তব্ধ থাকিয়া ভগ্নস্বরে বলিল "আর কেন বসন্ত, আজও আমায় ভুলিস নাই, কিন্তু আজ আমার পথ আর ঘরের দিকে নেই ত'—আজ আমার পথ ঐ—বলিয়া উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উপরের ঐ অনন্ত আকাশ কি সম্মুখের ঐ সমুন্নত পাহাড় কোন জিনিষের সঙ্কেত করিল—তাহা বসন্ত বুঝিতেই পারিল না—প্রভুর মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কিন্তু বীরেশ্বর আর কোন দিকে চাহিল না; কোন কথা কহিল না—বোধ হয় কথা কহিবার সামর্থ্যও তাহার ছিল না; আর স্নেহ বা প্রেম অথবা আঘাতের বেদনা যেন তাহাকে স্পর্শই করিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। যেন জীবনে তাহার কোন বেদনাই নাই—সংসারে তাহার কোন ঋণই নাই—যেন পৃথিবীতে তাহার দেনা পাওনা সব শোধ হইয়া গেছে। এমনই নির্ব্বিকার, এমনই অচঞ্চল, এমনই গম্ভীর ভাবে সে কুটীর হইতে বাহিরে আসিল যে, ইচ্ছা-মৃত্যু ভীষ্ম তদপেক্ষা নির্ব্বিকার ভাবে মৃত্যু বরণ

করিয়াছিলেন কিনা তাহা কেহ দেখে নাই বলিয়াই তুলনা করা গেল না।

পশ্চাতে বসন্ত আসিতেছিল—হাত নাড়িয়া তাহাকে আসিতে নিবারণ করিয়া বীরেশ্বর বোধ হয় স্বর্গ-পথ-যাত্রী রাজা যুধিষ্ঠিরের মতই বনপথ ধরিয়া চলিয়া গেল—শুধু সেই পার্ব্বত্য পথে তাহার শোণিতাক্ত পদরেখা নারায়ণের বুকে বিপ্রের চরণ রেখার মত বোধ করি চির-জাগ্রত রহিয়া গেল।

আর বসন্ত হতভাগিনী সুষমার অদৃষ্ট কল্পনা করিয়া এবং নিজে কি করিতে আসিয়া কি করিয়া ফেলিল ভাবিয়া, দুঃখে কষ্টে নৈরাশ্যে একেবারে ম্রিয়মান হইয়া পড়িল—আর বারংবার রোষ-কষায়িত নেত্রে মুনিয়ার দিকে চাহিতে লাগিল—কিন্তু তাহার অবস্থা যে বসন্ত'র চেয়ে কোন অংশে ভাল তাহা কিছুতেই বোধ করা গেল না—যখন এই দুই নারীর পরস্পর চোখাচোখী হইতেই উভয়েই কাঁদিয়া ফেলিল।

কিন্তু ঠিক এই সময়েই গৈরিক বেশধারিণী সুষমা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল—এবং সম্মুখেই শোণিতের ধারা দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। আর সেই কোন অতীত দিনের জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী তাহার আগমনের পূর্ব্বেই সফল হইয়া গেছে ভাবিয়া সজল চোখে চারিদিকে চাহিয়া বোধ করি স্বামীর মৃত দেহেরই

অন্বেষণ করিতেছিল—কিন্তু এই সময়েই বসন্ত ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া অত্যন্ত শুষ্কস্বরে কহিল 'এসেছ' হতভাগিনী, আর একটু আগে আস্‌তে পারলে না? তোমার 'স্বামীত' আর এখানে নাই—তিনি এই মাত্র ঐ বন পথে—

তাহার কথা সমাপ্ত হইবার আগেই সুষমা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিল—তিনি বেঁচে আছেন বসন্ত?

এখনও আছেন কিন্তু সংসারে তিনি আর ফিরবেন না।

সুষমা তখনই উত্তর করিল—আমিও ত' ফি'ব্ব না—কিন্তু সে যা' হোক, আয় তার পায়ের ধূলা নিই, কিন্তু না তার আর দরকার নাই—আমি চল্লাম—তোর মনের কথা আর আমার মনের কথা আজ দু'টোই অপ্রকাশ র'য়ে গেল—কিন্তু তা' হোক্ আমি আমার স্বামীর কাছে চ'ল্লাম, আমায় মনে রাখিস্ বোন্।

বসন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল—সোক রাণী, এই দুর্গম বনে তুমি তা'কে—

হাস্যমুখে সুষমা উত্তর করিল "আমার মন আর ক্ষণ আজ দুইই বদলে গেছে বসন্ত, আমি আজ দুর্গমের পথে সঙ্গিনী হব' ব'লেই বেরিয়েছি—স্বামীর ভোগেই কি সঙ্গিনী হ'তে হয় রে, তাঁর যোগের সঙ্গিনী হ'তে নেই? তুই ফিরে যা বসন্ত—গিয়ে আমার রাণীগিরিটা তুই ভাই ক'রগে—আমি দেখি তিনি হয়ত' কত দূরে গেলেন—

বলিয়া হাসি ও অশ্রু মাখা চোখে বিদায় লইয়া সুষমা সিংহিনীর মতই কি সিংহ-বাহিনীর মত সেই নিবিড় অরণ্য ভেদ করিয়া দুর্গম পার্ব্বত্য পথে অন্তর্হিত হইল।

সমাপ্ত

রাজার মেয়ে।

(ক)

বৃদ্ধ রাজা কেশব রায় যেদিন শত্রু করে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বুড়া কেশবলাল নাম লইয়া বনগমন করিলেন, সেদিন তাঁহার মৃত পুত্রের একমাত্র কন্যা কিশোরীই তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। কারণ এ সংসারে এই বৃদ্ধরাজার অন্য কেহ আত্মীয় শুধু ছিলই না নয়—যাঁহারা তাঁহার সম্পদে আত্মীয় সাজিতে আসিয়াছিলেন—উপর্য্যুপরি ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে রাজাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—অভিনয়ের শেষে দলবদ্ধ নাট্যামোদীর মত।

কেশব রায় ছিলেন পূর্ব্ব যুগের ক্ষুদ্র রাজা। তাঁহার রাজ্যও ছিল ক্ষুদ্র; কিন্তু বাহিরের এই ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতির অন্তরে যে প্রকাণ্ড এক স্নেহের সাম্রাজ্য ছিল, তাহারই স্নিগ্ধ ছায়াতলে রাজ্যের প্রজারা নিরতিশয় স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাইত। কঠোর শাসন ও প্রজার পীড়ন সে দেশের রাজনীতিজ্ঞগণের কল্পনাকে কর্ষণ করিতে পারিত না।

কিন্তু মধু মিষ্ট বলিয়াই ত তাহাকে মৌমাছির দংশন সহ্য করিতে হয়। বন্যার জল শুধু পাপীর গৃহই ধ্বংস করে না। তাহার প্রবল পরাক্রমের কাছে পুণ্যাত্মার গৃহও শির নত করে, শক্তির পদে শান্তির সন্ধি প্রার্থনা করার মত। দেশ তখন ধনধান্যে পূর্ণ; তাহার অভাব ছিল না বলিয়া চেষ্টাও ছিল না। আর দেশের বাহিরে ক্ষুধিত মানবের বাস আছে, তাহার বোধ করি ধারণাও ছিল না, তাই আত্মরক্ষার যত্নও ছিল না। কিন্তু দেশের অভাব ছিল না বলিয়া দেশের উপর হূনের দৃষ্টি পড়িবার অভাব হইল না; সে দলে দলে আসিয়া নিজের অন্ন সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আর তাহারই একটা বিক্ষিপ্ত বাহিনীর কতকাংশ আসিয়া এই বৃদ্ধ রাজার শান্তিময় রাজ্যের পাশে দৈত্যের মত দাঁড়াইল—শান্তির স্থানে শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে।

কিন্তু শান্তি একেবারেই শান্তভাবে নিজের আসন ত্যাগ করিতে চাহিল না এবং বিনা যুদ্ধে শক্তির প্রতিষ্ঠাও সম্ভবপর হইল না। কারণ কেশব রায় শুদ্ধ মাত্র শান্তিপ্রিয়ই ছিলেন না, সে শান্তির অপহরণ-কারীকেও দস্যু বলিয়া বিবেচনা করিতেন। যৌবনে এই কেশব রায়ই একদিন সিংহের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়াছিলেন, এবং সে যুদ্ধে নিজেই শুধু আহত হ'ন নাই, সিংহকেও এমনই আঘাত দিয়াছিলেন যে, তাহার ভীষণ গর্জ্জনে শুধু সে বনভূমিই নয়,

সেখানকার পল্লীগৃহও প্রকম্পিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ তাঁহার যৌবনই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার একটী মাত্র পুত্র অকালে পিতাকে ত্যাগ করিয়া এই বৃদ্ধকে বার্দ্ধক্যের এমনই অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছিল যে, সিংহ কেন সেদিন মানুষও তাঁহাকে দেখিলে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারিত না।

কিন্তু সম্পন্ন ও অসম্পন্নের মধ্যে যেমন প্রভেদ আছে, শক্তিমান ও শক্তিহীনের মধ্যে তেমনই প্রভেদ আছে। তাই মানুষ যাহাকে দেখিলে দয়া করিত, হুন তাঁহাকে আক্রমণ করিল, আর একদিনকার শক্তি-অভিমানী কেশব রায় সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন, শক্তিহীনের মত সন্ধি প্রার্থনা করিলেন না।

যুদ্ধও হইল; ক্ষুদ্র হইলেও সংগ্রাম ঘোরতর মূর্ত্তি ধরিতে ত্রুটী করিল না; এবং বৃদ্ধ কেশব রায় বৃদ্ধ হইয়াও বিপক্ষের সেনাপতিকে স্বহস্তেই বধ করিলেন। কিন্তু জয়লক্ষ্মী তাঁহার করায়ত্ত হইল না। কারণ ঠিক যে সময়ে কেশব রায়ের তরবারিতে হুনের ছিন্ন শির ভূলুণ্ঠিত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই বিদ্রোহী হুনের দল "কেশব রায় মরিয়াছে—কেশব রায় মরিয়াছে" বলিয়া এমনই একটা সোরগোল তুলিল যে, কেশব রায় জীবিত কি মৃত সে বিষয়ে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়াই তাঁহার বিলাসী সৈন্যগণ যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিল। আর কেশব রায় তাহাদের গতিরোধ করিবেন কি আত্মরক্ষা করিবেন

কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না—অগত্যা জয়ও : সম্ভবপর হইল না।

আর এই হুনের দল যুদ্ধ জয়ের পর মুহূর্ত্তেই বিজিত জাতির গৃহে গৃহে গিয়া বিজেতার শক্তি এমনই প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, যে যুদ্ধ হইতে প্রাণ লইয়া যাহারা পলাইয়া আসিয়াছিল, সে প্রাণ ধারণ করিবার মত যথেষ্ট তণ্ডুল কণাও পরদিন প্রভাতের জন্ম গৃহে অবশিষ্ট রহিল না। ভয়ে, অত্যাচারে, লুণ্ঠনের জ্বালায় প্রজারা গৃহ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল—যাহারা পলাইতে পারিল না তাহারা মরিল বা লুকাইল, যাহারা লুকাইতে লজ্জিত হইল—তাহারা যুদ্ধ করিল মরিল, মারিল—শান্তির সাম্রাজ্য শ্মশানে পরিণত করিল। আত্মশক্তির অভাবে মানুষের যাহা হয়—তাহাই হইল। কেশব রায়ের সাজান বাগান শুকাইয়া গেল।

কিন্তু পরের দিন উষাসমাগমের পূর্ব্বেই তাঁহার ধূমায়িত রাজধানী ত্যাগ করিয়া পরাজিত প্রতাড়িত রাজা যখন প্রস্থান করিতে যাইতে ছিলেন, তখন তাঁহার সেই বিপুল জনসঙ্কুল রাজ্যও রাজধানীর মধ্যে একটী মাত্র প্রাণী ভিন্ন সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কাল যেখানে আত্মীয় ও আত্মীয়তার অবধি ছিল না, আজ সেই স্থান এমনই শূন্য, এমনই অনাত্মীয়গণে পূর্ণ যে কাল যে এখানে উৎসবের বাতি জ্বলিয়াছিল, সুরভির উচ্ছ্বাস বায়ুস্তরে মিশিয়াছিল,

নৃত্যশীলা রমণীর হাস্য ও লাস্যে স্থান ও প্রাণ পূর্ণ হইয়াছিল, কেতকী ও কস্তুরীর মদির-গন্ধে তরুণ প্রাণ নৃত্যদোদুল করিয়া তুলিয়াছিল—আজ সেখানে তাহার রেখা মাত্র নাই। আজ প্রভাতের চাঞ্চল্য পীড়কের উল্লাস, পীড়িতের আর্ত্তনাদ ধূমায়িত দুর্গ মধ্যে এমনই এক প্রভাতের সূচনা করিয়াছিল যে, কাল যে এখানে একটা রাজার বসতি ছিল—একটা প্রতিষ্ঠিত-শান্তি সাম্রাজ্য ছিল, কাল পর্য্যন্ত এখানে যে একদল প্রজা পরম নিরুদ্বেগে কালযাপন করিয়াছিল—আজ আর তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। শুধু আশঙ্কা ও উদ্বেগ হাহাকার ও আর্ত্তনাদ উন্মত্ত বায়ু তরঙ্গের মত সারারাজ্যে ছুটাছুটি করিতেছিল।

ঠিক সেই সময়ে সেই রাজ্যের ষাট বছরের পুরাতন রাজা যখন পৌত্রীর হাত ধরিয়া বাহির হইলেন, নূতনকে স্থান করিয়া দিতে, তখন তাঁহার মুখ যতই প্রসন্ন থাকুক, অন্তঃপুরে বোধ হয় এমন চক্ষুই ছিল না, যেখান হইতে তপ্ত অশ্রু রেখা নারীর নলিন-নয়নের কজ্জল-রেখা বিধৌত করে নাই; কিন্তু অন্তরের অন্তঃপুরে যাহাই হউক, মানুষের আচরণে তাহার কিছুমাত্র বুঝা গেল না; কারণ সহানুভূতি ও রাজ-ভক্তি বোধ হয় সেদিন ভয়েই অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাই যাহার প্রাণে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহারই মুখ দেখিলে বোধ হইতেছিল যেন সে নিজেই আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। কেবল একটীমাত্র প্রাণী সেই নিষ্ঠুরতার কঠোরতার মধ্যে ও রাজার দুঃখে গলিয়া গিয়াছিল

—সে তাঁহার পৌত্রী কিশোরী। রাজার নিষ্ঠুর প্রজারা কেহই তাঁহাকে একটা সান্ত্বনার কথা বলিল না দেখিয়া—সে বলিয়া উঠিল "দাদুমণি, তুমি ভয় ক'রো না, আমি বড় হ'য়ে তোমাকে রাজা ক'রে দেবো।"

"দিবি?" বলিয়া রাজা সহাস্য মুখে তাহার পিঠ চাপড়াইতে গিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আর সেইরূপ মুখে হাসি চোখে জল লইয়া রাজা বর্ষণক্লান্ত দিবসের অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের মত নিজ শাসনের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

(খ)

তারপর পুরা দশটী বৎসর চলিয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মের ঔদ্ধত্য, শীতের শিশির দশবার আসিয়া গাছে পালায়, লতায় পাতায় প্রান্তরে, তাহাদের শাসনদণ্ড চালাইয়া গিয়াছে। পুরাতন প্রকৃতি অতি বৃদ্ধা হইয়াও কিন্তু তাহার যৌবনকে সেইরূপই মধুময়, সেইরূপই পরিবর্ত্তনশীল, সেইরূপই নব নব শোভার লীলা নিকেতন করিয়া রাখিয়াছে। বাহিরের পৃথিবীর মত কোথাও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। এই দশবৎসরে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কেবল কেশবরায়ের পৌত্রী কিশোরীর অঙ্গে, মনে, জীবনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থার। এই

দশবৎসরে অন্য অনেক নারীর মতই এই কিশোরী কৈশোর ছাড়িয়া যৌবনের মোহন সাঁজোয়া পরিয়াছে। কিন্তু সেদিন তাহার অন্তরে বাহিরে ভাবের বন্যাও অভাবের দৈন্য এমনই পাশাপাশি চলিয়াছিল যে, একটাকে বাদ দিয়া আর একটাকে অনুভব করা যাইতেছিল না। কারণ এই রূপসীর রূপরাশির সঙ্গে অপরিসীম দৈন্য আর রাজপুত্রী হইয়াও বনবাসের দুঃখ এই নারীর মধ্যে যে কঠোর মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা বোধ করি শুধু কল্পনা করিয়া বুঝিবার বা বুঝাইবার সাধ্য কাহারও নাই।

পুরা দশটি বৎসর—এই দশবৎসরে কেশবরায় আরও বৃদ্ধ হইয়াছেন, আরও শক্তিহীন হইয়াছেন—একেবারে শিশুর মত দুর্ব্বল। এই বৃদ্ধ রাজা কালের শাসনে সেদিন এমনই অসহায় হইয়াছিলেন যে, সে সময় যদি তাঁহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে তাঁহার মৃতদেহ সৎকার করা দূরে থাকুক, হয়ত স্থানান্তরিত করিবার লোক পাওয়া যাইত না। রাজ্য-ভ্রষ্ট রাজা মানুষের উপর একেবারেই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় যেখানে যাইলে মানুষের মুখ দেখা যাইবে না এইরূপ এক নিবিড় গহনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সে কানন এতই নিবিড় এতই মনুষ্য-পদচিহ্ন-সম্পর্ক শূন্য যে মধ্যে মধ্যে তিনি নিজের কণ্ঠস্বরে, নিজের পদশব্দেই চমকিত হইয়া উঠিতেন; আর ভাবিতেন যেদিন তাঁহার মৃত্যু হইবে, সেদিন এই কুসুম-কোমলা

বালিকাকে তিনি কোথায় রাখিবেন কাহার আশ্রয়ে রাখিবেন। কিন্তু সেদিন, এতবড় এই বিশ্বসংসারে তাঁহার এমন একটী আত্মীয় ছিল না, যাহার আশ্রয়ে কিশোরীকে রাখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে নিশ্চিতের পথে যাত্রা করিতে পারিতেন। শুধু ভাবনায়, বেদনায়, উদ্বেগে তাঁহার অস্বস্তির অন্ত রহিত না।

কিন্তু উদ্বেগ ও অস্বস্তি তাঁহার যতই হউক, যাহা নিশ্চয় তাহা যেমন নির্ভুল, যাহা অনুমান তাহাও সব সময়ে নিরর্থক নয়। কারণ মানুষের মন যে অন্তর্যামী; পৃথিবীর অন্য সমস্ত আদেশ ও অনুভূতিকেই হয়ত ভুল করা যায়, কিন্তু এখানকার আদেশ ও অনুভূতি এতই স্পষ্ট যে তাহাকে ভুল করিতে হইলে মনুষ্যজন্মের প্রতিষ্ঠাকেই ভুল করিতে হয়। তাই কেশবরায় যাহা অনুমান করিতে ছিলেন তাহাই একদিন সত্যের মূর্ত্তি ধরিল; আর ধরিল ঠিক সেই সময়ে যখন গগন-গহনব্যাপী মেঘ আসিয়া রাজার আশ্রয় স্থানকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, যেমন একদিন হুন আসিয়া তাঁহার রাজ্য আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আর রাজা সেই নিবিড় গহনে সেই মুক্ত আকাশ ও পৃথ্বীর মাঝখানে ঠিক সেইস্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, যেখান হইতে চিন্তামণির চরণ আর বেশীদূর নয়।

হায়রে! মৃত্যু মানবকে নিশ্চিন্ত করে সত্য, কিন্তু এই রাজা কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বেই চিন্তার এমন জটিলতম অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিলেন

যে, সে স্থান ছাড়িয়া তিনি যদি সত্যই কোন দিন চিন্তাহরণের চরণ-তলে পৌঁছিতে পারেন, তাহা হইলেও তাঁহার চিন্তারাশির শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

নগর ছাড়িয়া তিনি যেদিন বনে আসিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহার সঙ্গে ছিল তাঁহার পৌত্রী, আর তাঁহার পৌত্রীর সঙ্গে ছিলেন তিনি। আজ সেই একশাখ-বৃক্ষের একটীমাত্র শাখা বা কাণ্ডকে যদি স্থানচ্যুত করা হয়, তাহা হইলে জীবন সংশয় যে উভয়েরই হইবে, একথা যে কিছুতেই ভুল করিতে পারিতেছিলেন না, তাই প্রায় অনন্তজীবনপথ অতিক্রম করিয়া অনন্তের চরণতলে পৌঁছিবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই তাঁহার বেদনা হইয়াছিল অনন্ত। আর সেদিন মিত্র না হউক, অন্ততঃ একজন শত্রুকে পাইলেও তিনি কিশোরীর ভার দিতে পারিতেন। মনের মানুষ না হউক বনের মানুষও যে সিংহ ব্যাঘ্রের চেয়ে মানুষের বড় আত্মীয় এ সত্যকে অবিশ্বাস করিবার মত মনের বল সেদিন আর তাঁহার ছিল না।

(গ)

এমনই সময়েই একদিন এক নিশীথরাত্রে রাজা একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন আর উঠিবার জন্য নয়। একাকী রাজা বৃদ্ধ অসহায়, সঙ্গে তাঁহার একমাত্র নারী, বৈদ্য নাই, ঔষধ নাই, পরামর্শের

লোক পর্য্যন্ত নাই। গভীর রাত্রি; তখন বাহিরে বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত পৃথিবীতে মহাপ্রলয়ের সূচনা করিয়াছে, তখন দূর আকাশের দামামাধ্বনি নিবিড় কাননের প্রান্ত হইতে প্রান্ত প্রতিধ্বনিত করিয়াছে, তখন ঈশানের বিষাণ বাজিয়াছে, রুদ্রকে তাহার রৌদ্ররূপে প্রকট করিতে। আর ভিতরে, সেই উত্তেজিতা প্রকৃতির নিভৃত অন্তরে, ক্ষুদ্র কুটীরে রাজা কেশব রায় শুইয়া আছেন, দীন ক্ষীণ শীর্ণ, একেবারে শিরাসঙ্কুল। শিয়রে তাঁহার কিশোরী, পূর্ণাঙ্গী, নিরাভরণা রাজকন্যা তথাপি চীরমাত্র-ধারিণী, রূপময়ী, ভাবময়ী, আবেগময়ী একেবারে বৈশাখের নবনীরদমালার মত, ভাদ্রের ভরা নদীর মত। যেন বাহিরের এই উন্মত্তাপ্রকৃতির নির্ম্মম প্রহার হইতে রক্ষা করিবার জন্য মৃত্যুকে কোলে করিয়া মুক্তি বসিয়া আছে।

আর তাহারও পশ্চাতে এই পীড়িত ও সেবারতের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে এই ঝড় ও বৃষ্টির রাতে সশস্ত্র এক জন যে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মৃতপ্রায়কে একেবারে মৃত্যুর উপকূলে পৌঁছাইয়া দিতে, তাহা বোধ করি কেবল অন্তর্যামীই জানিতেন, তাই রাজাকে যন্ত্রণাকাতর দেখিয়া কিশোরী যখন জিজ্ঞাসা করিল "দাদুমণি! বড় কষ্ট হ'চ্ছে কি?"—তখন কেশব রায় হাসিয়া জবাব দিতে যাইতেছিলেন। সহসা একটা সুতীক্ষ্ণ তীর আসিয়া একেবারে রাজার মাথার কাছে মাটীতেই বিদ্ধ হইল, আর এই দুই অসহায় নরনারী সহসা শত্রুর

আক্রমনে আতঙ্কিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের সে আর্ত্তনাদ নিবিড় অরণ্যের বুক্ষে বুক্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিবার পূর্ব্বেই এক ভীমকায় হুন ভীষণ তরবারী হস্তে কুটীরে প্রবেশ করিল, আর একেবারে রাজার মাথা লক্ষ্য করিয়াই তাহার তরবারি উঠাইল। আর রুগ্ন রাজা ভয়ে বিস্ময়ে বিবর্ণ হইয়া "কিশোরী পালিয়ে আয়, কিশোরী পালিয়ে আয়' তোকে মার্ব্বে, বলিতে বলিতে তাহাকে আকর্ষণ করিতে গিয়া গৃহমধ্যস্থ প্রদীপটাই উল্টাইয়া ফেলিলেন, আর সেই মূহুর্ত্তেই অন্য এক শক্তিমানের সুতীক্ষ্ণ বল্লম আসিয়া একেবারে হুণের পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া ফেলিল। রাজার স্থানে হুন আর্ত্তনাদ করিয়া ধরাশায়ী হইল।

কিন্তু কেমন করিয়া এমন হইল—কে আসিয়া এই অন্ধকারে হুনকে বিনাশ করিল, কাহার মঙ্গল হস্ত এই পীড়িতের—এই অনাথের সেবায় এমনই করিয়া নিয়োজিত হইল? নরের আকারে নারায়ণ আসিয়া সত্যই কি এই দুর্ব্বলের পাশে দাঁড়াইলেন—সত্যই কি—কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারা গেল না। অদূরে তখনও হুন আর্ত্তনাদ করিতেছে, হয়ত রক্তস্রোত এখনই রাজার অঙ্গে আসিয়া স্পর্শ করিবে—এই সব ভাবনার সম্মিলিত আক্রমণকে উপেক্ষা করিয়া রাজা যখন দুর্ব্বল দেহ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তখন হুনের শেষ আর্ত্তনাদ তাহার কণ্ঠেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বাহিরে তখনও বায়ু প্রবলবেগে কুটীরে, প্রহৃত হইতেছিল, বৃক্ষে বৃক্ষ ঘর্ষণে বনানীর আর্ত্তনাদ দূরে ও অদূরে তখনও স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল, ঝাপটে দাপটে বারি ধারা তখনও ধরার বক্ষ দলিত মথিত করিতেছিল, আর আকাশের বক্ষে ক্ষীণ বিদ্যুৎ রেখা ভয়ে ভয়ে প্রকাশ পাইয়া ভয়েই অন্তর্হিত হইতেছিল। বাহিরে মহামার ভিতরে মহামার—মধ্যে তাহাদের স্তব্ধ অন্ধকার, নীরব গাম্ভীর্য্যেই বোধ হয়, কুটীরের জীবিত ও মৃত প্রাণী মাত্রকেই ক্ষণকালের জন্য নীরব করিয়া দিল।

কিন্তু হুনের শেষ আর্ত্তনাদ তাহার কণ্ঠেই বিলুপ্ত হইয়া গেলে যখন বুঝা গেল যে, তাহাকে আর বাঁচান যাইবে না, তখন হতাশ হইয়াই তাহার হত্যাকারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া নির্ভীক সুস্পষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কুটীরে কে আছেন, পারেন ত একটা আলো জ্বালুন, হুন মরিয়াছে।"

অন্ধকার হইতেই রাজা প্রশ্ন করিলেন "আমাদের রক্ষাকর্ত্তা আপনি কে?"

"আমি একজন সৈনিক মাত্র কিন্তু পরিচয়ে প্রয়োজন কি মহাভাগ! আপনি নির্ভয় হইয়াছেন আলো জ্বালুন।"

কিন্তু আলো যখন জ্বালা হইল, তখন এই সৈনিকের অঙ্গে রাজবেশ দেখিয়া রাজা একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন। আর

অন্তর্যামী যে সত্যই তাহাকে মুক্তি দিবার জন্ম বরাভয়কর প্রসার করিয়াছেন, তাহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না বলিয়াই আনন্দেরও অবধি রহিল না। তিনি করাঙ্গুলি সঙ্কেতে সৈনিককে বসিতে ইঙ্গিত করিয়াই কিশোরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "ঘরে কি কিছুই নাই বোন—আজ রাজ-অতিথি আমার দ্বারে এসে অভুক্ত থাক্‌বেন?

কিশোরী এতক্ষণ রক্তাক্ত কলেবর হুনটার দিকেই চাহিয়াছিল। রাজার কথা শুনিয়া অতিথির পানে ফিরিতেই সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল; ঠিক এই লোকটাকেই সে আজ প্রভাতে বনের মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়াছিল, কিন্তু সেও যে কিশোরীকে লক্ষ্য করিয়াছে, এমন কি তাহার আবাসস্থানেরও সন্ধান লইয়াছে, তাহা সে মোটেই বুঝিতে পারে নাই। পারিলে হয়ত সে নিজের বাসের সন্ধান এই লোকটাকে কিছুতেই দিত না, হয়ত বনানীর নিবিড় বৃক্ষান্তরালে এমনভাবে আত্মগোপন ক'রত যে, এই কুটীরের সন্ধান সে কিছুতেই পাইত না। কিন্তু উদ্দেশ্য তাহার যাহাই থাকুক, এই লোকটাই যদি আজ কুটীরের সন্ধান না পাইত এবং ঠিক এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে আজ ঐ হুনটার স্থানে কাহার দেহ প্রলম্বিত হইত তাহা ভাবিতেও সে শিহরিয়া উঠিল।

কিন্তু তাহাকে অযথা বিলম্ব করিতে দেখিয়া রাজা অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, ঘরে কি কিছুই রাখিস্ নাই কিশোরী?"

"এই যে দিই দাদামণি! কিন্তু আপনার রাজ অতিথিকে শুধু দুটো বনের ফল—বলিতে বলিতে কিশোরী অত্যন্ত ক্ষুন্নমনে গোটা-কয়েক ফল আনিয়া অতিথির সম্মুখে রাখিল। অতিথি হাস্যমুখে তাহা হইতে একটা ফল তুলিয়া লইয়া বলিলেন 'আজ কার আতিথ্যে সম্মানিত হ'চ্ছি মহাভাগ?"

চিন্তামাত্র না করিয়া কেশব রায় উত্তর দিলেন "শ্রীমতি কিশোরী দেবীর—বলিয়াই কিশোরীর দিকে চাহিয়া তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন।

রাজার হাস্যের প্রত্যুত্তরে কিশোরী বলিয়া উঠিল "পরিচয় সম্পূর্ণ হ'ল না দাদামণি, আমি যে শুধু কিশোরী নই, রাজা কেশবরায়ের পৌত্রী কিশোরী—

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলা হইতেই আগন্তুক সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন "সে কি মহারাজ! এই নিবিড় অরণ্যে সিংহশার্দ্দূলের সঙ্গে"—

হাস্যমুখে কেশবরায় উত্তর দিলেন "কিন্তু এইখানেই আমি সঙ্গী পেয়েছি বন্ধু, কারণ মানুষের সঙ্গ আমার আর সহ্য হ'ল না রক্ষাকর্ত্তা! তাই মৃত্যুর মুখে আমি বনকেই আমার আশ্রম ক'রে তুলেছি। আর এই বনেই দশ বৎসর পরে একজন অমানুষের পশ্চাতে আজ মানুষের সন্ধান পেয়েছি—পরিচয় সম্পূর্ণ করুন মহাভাগ।

"কাশ্মীরের যুবরাজ হিরণচাঁদ আপনার আতিথ্যে সম্মানিত হ'ল। কিন্তু তার জন্য ব্যস্ত হবেন না মহারাজ! এই গৃহছেড়ে দীনের তাঁবুতে আসুন রাজা! আজ থেকে আপনি আমার বহু সম্মানিত অতিথি হবেন"—

"কিন্তু তা' হয় না যুবরাজ, হুন যেদিন বলে আমায় পরাস্ত ক'রে রাজ্য ও সিংহাসন দখল করেছে, আর তার সঙ্গে মানুষের স্নেহ থেকে বঞ্চিত ক'রেছে সেইদিন আমি বনাশ্রম গ্রহণ ক'রেছি। আমি আজ এত পীড়িত হ'য়েছি যে, দশবৎসর যে গৃহে বাস ক'রেছি, সেই গৃহ হয়ত আমায় আর দশদিনও আশ্রয় দেবে না। কিন্তু তবুও আজ তার স্নেহ আলিঙ্গনকে আমি ত্যাগ ক'র্ত্তে পার্ব্ব না। আপনি বরং আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন "কিন্তু এই সময়েই কিশোরী তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল "তা'ও হয় না দাদামণি, যে রাজ্য আমরা হারিয়েছি তা'র পুনরুদ্ধার না ক'র্ত্তে পার্লে এ জীবনেও যেমন প্রয়োজন নাই, এ বনভূমিত্যাগেরও তেমনই প্রয়োজন নেই, আমি যে আপনার রাজ্য ফিরিয়ে দেব দাদামণি; আপনি বরং যুবরাজকে বলুন, তিনি আমাদের কিছু সৈন্য সাহায্য করুন, আমরা আর একবার আমাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করি।

কেশবরায় উচ্চহাস্য করিলেন মাত্র, কিছু বলিলেন না। কিন্তু রাজপুত্র ক্ষণকাল নীরব থাকিয়াই বলিয়া উঠিলেন "তার চেয়ে

মহারাজ, আপনি আদেশ করুন, আমি আপনার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার ক'রে দেই।"

রাজা সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন "না না এ আপনি কি ব'লছেন রাজপুত্র, আমি নিঃস্ব হ'য়েছি ব'লে আজ আমার অতিথিকে আমি মৃত্যুর মুখে পাঠা'তে পার্ব্ব না, রাজ্যে আমার কোন প্রয়োজন নেই রাজকুমার, আমার মৃত্যুর পর এই হতভাগিনীকে তুমি আশ্রয় দিও। কারণ আমার মৃত্যুর পরে পৃথিবীতে তার দ্বিতীয় আত্মীয় জীবিত থাকবে না, আমি বড় দুর্ব্বল হ'য়েছি আর কথা কইতে পাচ্ছিনা—" বলিয়া বোধ হয় তিনি উদ্যত অশ্রুবিন্দুকেই চাপা দিলেন।

কিন্তু রাজপুত্রের অন্তরও বোধ হয় প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন "রাজা, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হ'য়ে আমি বেরিয়েছি—আমার শক্তিও মেধার পরীক্ষা কর্ত্তে। সুযোগ পেয়ে আজ শক্তির পরীক্ষা না ক'লে ক্ষত্রিয় শক্তির অপমান হবে। আর আজ যাঁর মহৎ আশ্রয়ে আমি অজ্ঞানে অতিথি হ'য়েছি তাঁকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত না কর্লে রাজপুত্রের অমর্যাদা হবে। আমায় বিদায় দিন মহারাজ, আমি এইখান থেকেই যুদ্ধযাত্রা করি। কাল সূর্য্যের শেষ কিরণ রশ্মি অস্তাচলে অন্তর্হিত হ'বার আগে আমি বা আমার মৃত্যু সংবাদ আপনাকে জয় পরাজয়ের বার্ত্তা জানিয়ে দেবে। বিদায় মহারাজ।" এইমাত্র বলিয়াই তিনি হূনের মৃত দেহটা পুনরায়

বর্শা বিদ্ধ করিয়া লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু ঠিক বাহিরে যাইবার সময় তিনি সহসা কি জানি কিসের আকর্ষণে একবার পশ্চাৎ ফিরিলেন, ফিরিতেই দেখিলেন একজোড়া সজল-কোমল-আঁখি-পল্লব তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গিয়াছে।

(ঘ)

ঠিক সেই দিন প্রাতঃকালে কিশোরী যখন বর্শাহস্তে প্রতিদিনের মতই ফল আহরণ করিতে বাহির হইয়াছিল তখনই বনের দুই প্রান্ত হইতে একই সময়ে সে এই হুনের ও রাজপুত্রের নয়নপথবর্ত্তিনী হয়। সে নিজে রাজপুত্রকে দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু রাজপুত্রও যে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, আর দেখিয়াছিলেন ঠিক সেই সময়ে যে সময় এই তরুণী রূপসী বর্শা দিয়া বৃক্ষের ফল আহরণ করিতেছিল তাহা তরুণী নিজে বুঝিতেই পারে নাই। কিন্তু সেই উর্দ্ধ-বাহু তরুণীর পরিপূর্ণ মুখ মণ্ডলে প্রভাত সূর্য্যের তরুণ কিরণ কি বিচিত্র বর্ণে বিকম্পিত হইয়া যাইতেছিল, আর অপর পক্ষ সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া কি ভাবে সে মুখের প্রতি চাহিয়াছিল, চাহিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহা বোধ করি কোন অশরীরি দেবাত্মা ভিন্ন আর কেহ দেখিতে পায় নাই।

৫

বনে এতদিন পরে মানুষের আবির্ভাবে সে একটু ভীত ও চকিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু মনুষ্য-সমাগম-সম্পর্ক বিহীন বনে মানুষের আগমনে সঙ্গীহীনতার অভাব দূর হইবে ভাবিয়া তাহার অন্তর উৎফুল্ল হয় নাই, একথা বলিলে কিশোরীকে মনুষ্য শ্রেণীর বাহিরেই ফেলিতে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই রাজপুত্রের সঙ্গে সৈন্য সহচর দেখিয়া কতকটা ভয়েই সে যখন নিজেকে সাধ্যমত বনান্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহার দাদামণিকে সংবাদ দিতে—তখন হুন ও রাজপুত্র যে বিভিন্ন দিক হইতে তাহার কুটীর লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহা সে মোটেই বুঝিতে পারে নাই। আর কুটীরে আসিয়া রাজাকে অধিকতর পীড়িত দেখিয়া কথাটা তাহার অন্তরে অধিকক্ষণ স্থানও পায় নাই।

কিন্তু নিয়তির অঙ্গুলী সঞ্চালনেই বোধ হয় ঠিক নিশা-সমাগমের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই আকাশ যখন ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখনই এই দুই জন নবাগত নর কুটীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল, একজন সুন্দরী অপহরণ করিতে, অন্যজন এই কুটীরবাসিনীকে প্রবল বৃষ্টি ও ঝটিকার আক্রমণ হইতে প্রয়োজন হইলে রক্ষা করিতে; কারণ এই নিবিড়বনে শিবিরবাসী রাজপুত্র এই সুন্দরী তরুণীকে দেখিয়া এতই বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, এখানে এই বালিকার থাকিবার কি প্রয়োজন হইয়াছে, এবং সে কোথায় কি ভাবে আছে, তাহা জানিবার

কৌতূহল একেবারে অদম্য হইয়া উঠিয়াছিল ; আর সন্ধ্যার প্রাক্কালেই যখন ঝড়ে ও জলে বনভূমি বারংবার প্রকম্পিত হইয়া উঠিতেছিল, তখনই সহসা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল যে, এই সিংহ শার্দ্দূল পরিবেষ্টিত অরণ্যে, এই রাত্রে কুটীরবাসিনী একাকিনী কি করিবে।

কুটীরবাসিনী কি করিত, তাহা অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু রাজপুত্র আসিয়া যখন কুটীর হইতে কিয়দ্দূরে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইলেন, তখন সহসা আকাশে যে অগ্নিরেখা আত্মপ্রকাশ করিয়াই অন্তর্হিত হইল, তাহারই আলোকে তিনি দেখিলেন এক ভীমকায় পুরুষ উদ্যত অস্ত্র লইয়া কুটীরাভ্যন্তরে লক্ষ্য করিতেছে। দারুণ অন্ধকার। একেবারে দারুণ ; একটীমাত্র পদক্ষেপ করিতেও যে দৃষ্টিক্ষেপের প্রয়োজন হয়, অন্ধকারে তাহাও করা যায় না—সেখানে এত অন্ধকার। কিন্তু তবুও তিনি ঝটিকা বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া যখন কুটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন কুটীরে আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইয়াছে। রাজপুত্র দ্বিধামাত্র না করিয়া ভূপের পৃষ্ঠে বর্শাবিদ্ধ করিলেন।

কিন্তু রাজপুত্র চলিয়া যাইলে কেশব রায় যখন আত্মস্থ হইলেন, তখন বৃষ্টি ছাড়িয়া গিয়াছে, ধরিত্রী অপেক্ষাকৃত শান্ত মূর্ত্তি ধরিয়াছে। বাহিরে চাহিয়া তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সহসা রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন "রাক্ষসী, তোর জন্য আজ একটা তরুণ প্রাণ মৃত্যুর মুখে ছুটে গেল" বলিয়াই তিনি মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িলেন, অপর

পক্ষের মুখের ভাবটা যে এই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত বাক্যে কি বর্ণ ধারণ করিল তাহা লক্ষ্যও করিলেন না।

(৬)

নিশা অবসানে আবার প্রসন্ন নবীন মূৰ্ত্তিতে প্রভাতের উদয় হইল; কিশোরীর স্নিগ্ধ সজল মুখকান্তির মত প্রভাত; স্বচ্ছ, শীতস্পর্শ, সিক্ত বৃক্ষপল্লবের শ্যামশোভায় বিশোভিত, পক্ষী-কূজন-মুখরিত শীর্ষে তাহার কনককিরীট। যেন বিগত রজনীর বিভীষিকাময়ী স্মৃতিকে মানবের মন হইতে একেবারে নিঃশেষে তুলিয়া লইবার জন্য প্রভাত আজ সর্ব্বজন-মোহন মূর্ত্তিতে এই কাননে প্রথম পদার্পণ করিয়াছে।

কিন্তু আজ কাননের শোভা, প্রভাতের রূপ, প্রকৃতির এমন স্নেহময়ী প্রকৃতি কাননবাসী রাজা বা সে কাননের রাণীকে কিছুমাত্র তৃপ্তিদান করিল না। বিগত রজনীর স্মৃতি দুষ্ট ব্রণের মত এই দুই তরুণ ও করুণ প্রাণকে নিয়ত বেদনাবিদ্ধ করিতেই লাগিল, আর তাহাদের জন্য আর একটি তরুণ প্রাণ যে, রণে আজ কত খানি শোণিতক্ষয় করিতেছে তাহাই ভাবিয়া ভয়ে বেদনায় অকল্যাণ আশঙ্কায় পুনঃপুনঃ শিহরিত হইতে লাগিল। সেদিন তাঁহাদের আহারাদি পর্য্যন্ত হইল না।

কিন্তু দিনদেব তাঁহার দৈনিক জীবনের মধ্যপথে আসিয়া উপস্থিত হইলে, একজন অশ্বারোহী কানন-প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, প্রথমযুদ্ধে তাহাদের পরাজয় হইয়াছে এবং যুবরাজ রাজাকে আত্মরক্ষা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কারণ তিনি দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিয়াও যদি পরাজিত হন তাহা হইলে অবশ্য তাঁহার জীবিত দেহ ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু হুন আসিয়া যেন রাজাকে আক্রমণ করিতে না পারে। কিন্তু তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কিশোরী গৃহ হইতে তরবারী ও বর্শা লইয়া বাহিরে আসিয়া সৈনিকের অশ্ববল্গা ধরিয়া দাঁড়াইল—দাঁড়াইয়াই রাজার দিকে চাহিয়া শুধু বলিল "দাদামণি।"

রাজা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া বলিয়া উঠিলেন "যা কিশোরী, আমি ছাড়া আমার দ্বিতীয় সৈন্য ও সম্বল তুই, কিন্তু দাঁড়া। সৈনিক, আর একটা অশ্ব পাব না?"

সৈনিক ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তাহাদের শিবিরে বোধ হয় আর একটা ক্ষুদ্র অশ্ব আছে, কিন্তু—

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই রাজা বলিলেন "চল ভাই, আমি সেই অশ্বটাই চাই, কারণ সেইটাই আমার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত হবে।"

তারপর অশ্ব ও অস্ত্র লইয়া রাজা যখন রুগ্নদেহ লইয়া যুদ্ধস্থলে প্রবেশ করিলেন, তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। কিশোরীকে পাশে রাখিয়া

তিনি যখন রণমত্ত হিরণ চাঁদের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন, তখন প্রতিপক্ষ দূর হইতে এমন এক বর্ষা নিক্ষেপ করিয়াছে যে, হিরণচাঁদের নিক্ষিপ্ত বর্শা বিপক্ষের অঙ্গ স্পর্শ করিবার আগেই হিরণচাঁদের বক্ষ বিদ্ধ হইবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। রাজা মুহূর্ত্তমধ্যে যুবরাজের ঘোড়াকে এমনই আঘাত করিলেন যে, ঘোড়া একলম্ফে পাঁচ হাত দূরে গিয়াই শুইয়া পড়িল, আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিপক্ষের বল্লম আসিয়া রাজার দক্ষিণ স্কন্ধে বিদ্ধ হইল; রাজা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। কিন্তু হিরণচাঁদ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া হুনকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাঁহার বর্শা আসিয়া হুনকে বিদ্ধ করিয়াছে! কিন্তু সম্মুখে যুবরাজকে দেখিয়া হুণ তরবারী বাহির করিতে চেষ্টা করিল, আর সেই মুহূর্ত্তেই যুবরাজের তরবারী তাহার সকল আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া দিল।

যুদ্ধ শেষে হিরণচাঁদ ও কিশোরী বৃদ্ধ কেশবরায়কে ধরিয়া যখন রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করিল, তখনও রাজার স্কন্ধ হইতে প্রবলবেগে শোণিতক্ষরণ হইতেছিল; তাঁহাকে সিংহাসনের সম্মুখে আনিয়া হিরণচাঁদ বলিলেন 'রণজয়ী মহারাজ! এই আপনার সিংহাসন, আপনি শুদ্ধ যুদ্ধই জয় করেন নি, আমারও জীবন দিয়াছেন। আপনার সিংহাসনে বসুন মহারাজ।"

কিন্তু রাজা সে কথার কোন উত্তর না দেওয়াতে কিশোরী কাঁদিয়া বলিল, 'দাদামণি এই যে তোমার হারাণো সিংহাসন!' কষ্টে হাসিয়া রাজা বলিলেন "হাঁ" বোন্ তুই তোর কথা রেখেছিস, কিন্তু 'ওত' আজ আমার জন্য নয়; আর কার জন্য দেখিয়ে দিই— এই বলিয়া তিনি কিশোরী ও যুবরাজকে সেই সিংহাসনে বসাইয়া বলিলেন "এই আমার সবচেয়ে বড় রাজ্যলাভ হ'ল কিশোরী; মহারাজ! আজ তোমার অতি বৃদ্ধ প্রজা, বড় আনন্দে তোমায় আশীর্ব্বাদ ও অভিবাদন ক'রছে—এই বলিয়াই তিনি সেই হর্ম্মতলেই শুইয়া পড়িলেন। আর হিরণচাঁদ ও কিশোরী রাজদেহ তাড়াতাড়ি ভূমি হইতে উঠাইতে গিয়া দেখিল যে, কেশবরায়ের দেহ মাত্র পড়িয়া আছে—সে দেহে কেশবরায় নাই।

সমাপ্ত।